বাঙলা গানের আঙিনায়

যূথিকা বসু



পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ২০০০

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ :
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

অক্ষর বিন্যাস :
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রণ :
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৪

মা ও বাবাকে
যাঁরা আমায় গান ভালবাসতে শিখিয়েছেন

লেখিকার অন্য বই :

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা : উনিশ শতক

শুভায় ভবতু

শ্রীমতী যূথিকা বসু বিশ্বভারতীতে সাহিত্যের অধ্যাপিকা। সাহিত্যের অধ্যাপনার সঙ্গে চর্চা করেন সঙ্গীতের —দুই বিষয়েই তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপনা তাঁর পেশা, সঙ্গীত তাঁর সহজাত সংস্কার। তিনি যখন সঙ্গীত বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন তখন অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই লেখেন, যে প্রেরণায় তিনি গান গেয়ে থাকেন পেশার সঙ্গে নেশাকে মিলিয়ে।

বইটা পড়ে এমন কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। লেখিকার মূল বক্তব্যও তাই। তিনি দেখেছেন বাঙালি এক হাজার বছর নানা গানের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছে চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিক 'জীবনমুখী' গান পর্যন্ত। বাঙালির সংস্কৃতি নগরজীবন নির্ভর হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই হাটে মাঠে ঘাটে কীর্তনে বাউলে ভাটিয়ালিতে জারীতে শারীতে ভাওয়াইয়ায় রামপ্রসাদী গানে কবিওয়ালার গানে নিধুবাবুর টপ্পায় তার সঙ্গীতপ্রিয়তার অজস্র বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কালের থিয়েটারি গান গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও পরবর্তী কালের বহু বিচিত্র গানের ধারা বাঙালির উৎসবে অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি এসব গানের প্রকরণ আলোচনা ততখানি করেন নি, কিন্তু বিস্ময়কর সূক্ষ্মতায় সঙ্গীত সৃষ্টির রহস্য মেলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঙ্গে চমৎকার মিলিয়ে দিয়েছেন। কথা ও সুরের পারস্পরিক নির্ভরের একই ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছেন দুজনের আলোচনাতেই। তাতে লেখিকার বক্তব্যে মিলেছে বোধির সঙ্গে যুক্তি, কথার শব্দার্থগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সুরের ভাবাশ্রয়ী ব্যঞ্জনার দিঙনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ গানের ধর্ম নানা ভাবে নানা জায়গায় বুঝিয়েছেন। যূথিকার মূল বক্তব্য এই যে, গানের আশ্রয় জীবন — 'জীবনমুখী' নাম দিই আর না দিই।

তার ভাষা ও ভঙ্গি পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রকরণগত জটিলতার ওপর জোর না দেওয়ায় তার আলোচনা বিশেষজ্ঞ ও অবিশেষজ্ঞ নির্বিশেষে সবার কাছেই হয়েছে উপভোগ্য।

ভূমিকা

কোন্ সুদূর শৈশবে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেছিলাম তা আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। বেদনার্ত স্মৃতি শুধু মনে করিয়ে দেয় পরলোকগতা সুজাতা মিত্র— আমার মায়ের গাওয়া গানগুলিকে যা শুনে শৈশবেই বুকের ভিতরে আলোড়ন অনুভব করতাম, অঝোর ধারায় বইত অশ্রুধারা। তখন বুঝতে শিখি নি কেন এমন হয়! পরবর্তীকালে পরিণত মনে বুঝেছি যে, মায়ের গানের সুর এবং গান গাওয়ার আন্তরিক মগ্ন ভঙ্গীটি আমার হৃদয়ের অতল তলে ভাবের তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করত, সমস্ত অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে যেত সুরের মর্মস্পর্শী অনুরণন — তারই হার্দিক প্রকাশ ওই অশ্রু। নিতান্ত শৈশব থেকেই সঙ্গীতের প্রভাব কিম্বা প্রতিক্রিয়া ঘটত আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে। এরপর নিয়মিত বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা ও চর্চাই শুধু নয়, সঙ্গীতসাধনা আমাকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীত ব্যতিরিক্ত জীবনের কথা আমি কোনদিনই ভাবতে পারি নি, আজও পারি না।

সঙ্গীতের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে নানা সময়ে মনে নানা ভাবনার উদয় হয়েছে। সেসব ভাবনার সঙ্গে যে সবসময় কোন আলোচনা গ্রন্থপাঠের সংযোগ আছে, এমন নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সঙ্গীত সম্পর্কে আমার নিজের অনুভব ও নিজের বিশ্লেষণই প্রবন্ধগুলিতে ঠাঁই পেয়েছে। অবশ্য কোন কোন প্রবন্ধ যেমন — 'বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতভাবনা' কিম্বা 'বাংলাগানের দু'শো বছর' অথবা 'বাঙ্গালীর সঙ্গীত সংস্কৃতি' প্রভৃতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত নানা প্রবন্ধ, বাংলা গানের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য কিছু কিছু গ্রন্থপরিক্রমা নিশ্চয়ই করেছি। এই গ্রন্থের বেশ কিছু প্রবন্ধই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার সঙ্গীত শিক্ষার গুরু ছিলেন স্বর্গত মনোরঞ্জন দাস যিনি স্বর্গত পন্ডিত জ্ঞান গোস্বামীর সাক্ষাত শিষ্য। তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতি ছিল অতি চমৎকার। স্বরের উচ্চারণ কীভাবে করতে হবে, ধ্বনির অনুরণন কীভাবে জাগবে, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর কী বিশেষত্ব, সুরও বাণীর সম্পর্ক কতখানি গভীর প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়ই তিনি আলোচনা করতেন। সঙ্গীত যে সাধনার বস্তু তা তিনিই আমাকে বুঝতে শিখিয়েছেন। সেই শিক্ষা স্মরণে রেখে এবং আমার নিজের সঙ্গীতচর্চার অভিজ্ঞতা থেকেই 'সঙ্গীত ভাবনা' প্রবন্ধের অবতারণা। এই বোধকে যিনি আরো পুষ্ট করতে সহায়তা করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রসঙ্গত, তাঁর কাছেও আমার ঋণ অপরিসীম।

বাংলা গানের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে বিভিন্ন সময়ে তার রূপ ও রীতির যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন নতুন সম্ভাবনার ঐশ্বর্যে বাংলাগানের ভাণ্ডার পুষ্ট হয়ে

উঠেছে, তা আমাদের সকলেরই কমবেশী জানা। 'কীর্তন' গান আমরা সকলেই শুনে থাকি, দক্ষ গায়ক-গায়িকার কীর্তন আমাদের ভাবাপ্লুতও করে। তার বেশি কিন্তু সাধারণত আমরা ভাবতে চাই না। সেক্ষেত্রে অন্যান্য নানা ধরনের গানের আলোচনার সঙ্গে কীর্তনেরও কিছু বিশিষ্টতার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা আছে 'প্রাগাধুনিক বাংলা গানের দু'শো বছর' শীর্ষক প্রবন্ধে। দু'শো বছরের ইতিহাস অনুসন্ধান যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ। যেসব গানের বিভিন্ন রূপ ও ঐতিহ্য একদিন বাংলাদেশকে মাতিয়ে রেখেছিল তার মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত অন্যতম। নিধুবাবু যে টপ্পা ছাড়াও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেকথাও জানা যায়। তাছাড়া, বাউল-কবিগান-আখড়াই-হাফ-আখড়াই, যাত্রা-পাঁচালি-তর্জা, ইংরেজ আমলে সঙ্গীতের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন, ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন, রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল-কাজী নজরুলের গানের সেতু বেয়ে বাংলা গানের সাম্প্রতিক কালে পদচারণা। সমকালীন গীতিকার সুরকার গায়কদের প্রসঙ্গ নানা গুণীজনের আলোচনায় বহুল পরিমাণে স্থান পেয়েছে বলে এই প্রবন্ধে সেগুলি ছুঁয়ে গেছিমাত্র। তবে নজরুলের গান সম্পর্কে আলোচনা আমার একাধিক প্রবন্ধে আছে।

যে কোন জাতির আত্মপ্রকাশের নানা মাধ্যমের মধ্যে সঙ্গীত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল ধারা যার ভিতর দিয়ে একটি জাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হতে পারে। সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে গীতিপ্রাণতা লুকিয়ে আছে একথা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালি জাতির সেই গীতিপ্রাণতা নানা রাজনৈতিক দল-বদলে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যুগে যুগে যা বাংলাদেশের শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। এইসব গানে বাঙালির লৌকিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক বিশেষত্বের পরিচয়ই লুকিয়ে আছে যা আলোচিত হয়েছে 'বাঙালির সঙ্গীত সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে।

অধিকাংশ প্রবন্ধই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির ফসল—সকলে তার সঙ্গে সহমত না হতেও পারেন। যেমন, 'জীবনমুখী গান' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এই বিশেষ নামে কোন বিশেষ গানকে চিহ্নিত করতে রাজী নই। সঙ্গীত অথবা যে কোন শিল্পই জীবন-সম্ভব। তবে অন্যান্য গানের ক্ষেত্রে যেমন আবেগের অন্তর্মুখীনতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, গভীর ব্যঞ্জনাধর্মিতা থাকে, বর্তমানের 'জীবনমুখী' শীর্ষক গানে যেন সেই সূক্ষ্মতার কিঞ্চিৎ অভাব চোখে পড়ে। মনে হয় যেন জীবনের উপরিতলের চাওয়া পাওয়ার হিসাবকেই এইসব গানে বড় করে তোলা হয়েছে। অথচ সঙ্গীত সর্ম্পকে আমাদের সংস্কার ভিন্ন কথা বলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতভাবনা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। আমরা তাঁকে সাহিত্যিকরূপেই জানি। সঙ্গীতবিষয়ে তাঁর যে বৈজ্ঞানিকসুলভ বিশ্লেষণাত্মক ধারণা ছিল তা অধিকাংশ সময়েই স্মরণে থাকে না। অথচ প্রবন্ধটির জন্য তথ্যের অনুসন্ধান

করতে গিয়ে এত বিপুল তথ্যভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল যা আমাকে বিস্মিত করেছে। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি লিখে যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি।

'তারাশঙ্করের গান' শীর্ষক প্রবন্ধটির উৎস শ্রীসরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারাশঙ্করের গান' শীর্ষক গ্রন্থখানি। সঙ্কলনটি তারাশঙ্করের রচিত গানে সমৃদ্ধ। বহু গানই চলচ্চিত্র কিম্বা রেকর্ডের ফলে পরিচিত। সেখান থেকেই আমার লিখিত প্রবন্ধটির সূত্রপাত। সঙ্গীতে এমনই মোহজাল আছে যা সাধারণ পরিস্থিতিকে অসাধারণ, সামান্যকে অসামান্য করে তুলতে পারে, অনুভবের প্রগাঢ়তায় মগ্ন হয় মন। তারাশঙ্করের রচিত গানগুলি জীবনের সেই গভীর সূক্ষ্ম অনুভূতির অসামান্য রসরূপ।

'শাক্তপদাবলী ও তার আধুনিক চর্চা' শীর্ষক বিষয়টিও আমার কাছে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। অষ্টাদশ শতকের বিশেষ এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত শাক্তগীতি যে উনিশ-বিশ শতকেও লুপ্ত হয়ে যায় নি, পরন্তু শক্তিদেবীকে, আগমনী-বিজয়াকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা হয়েছে, উক্ত প্রবন্ধে তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। প্রসঙ্গত কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত রচনার প্রেক্ষাপটটিও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়েছে।

নজরুলসঙ্গীত সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে নজরুলের গানের মাধুর্য অনুসন্ধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যানুসন্ধানেই আমার মগ্নতা— বাহ্যিক প্রকরণের জটিল নীরসতা হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গীতের মাধুর্যকে অনুভব করতে সহায়তা করে, কিন্তু সবটুকু নয়। তাই সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে যতটা সম্ভব প্রকরণের দিকটি পরিহার করার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁদের সহায়তা, প্রেরণা ও উৎসাহ বিস্মৃত হবার নয় তারা হলেন শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী। এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল অনেকদিনের; কিন্তু বাস্তবায়িত করার বিষয়ে অলসতা যেন পেয়ে বসেছিল। সেই জড়তা থেকে শ্রীচক্রবর্তী আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। গ্রন্থ প্রকাশে অশেষ সাহায্য করেছেন 'পরিকথা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং প্রচ্ছদপত্র নির্মাণে সম্মত হয়ে আমাকে বাধিত করেছেন যশস্বী শিল্পী শ্রীযুধাজিৎ সেনগুপ্ত। বলা বাহুল্য, 'পুস্তক বিপণি'র প্রধান শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার মুদ্রণ চারুতায় বিশেষ যত্ন নিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। প্রসঙ্গত স্মরণ করতেই হয় আমার কন্যা শ্রীমতী আবীরা বসু চক্রবর্তী ও জামাতা প্রিয়দর্শী চক্রবর্তীকে যাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আমি উজ্জীবিত হয়েছি প্রতিটি দিন। আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই শ্রীভবতোষ দত্ত মহাশয় আমার আবদার মঞ্জুর করেছেন তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। ধন্যবাদ নয়, স্নেহ জানাই আমার বহু ছাত্র-ছাত্রীকে যারা বারবার অভিযোগ জানিয়েছেন কেন আমি বই প্রকাশ করি না বলে। তাদের অভিযোগ উৎসাহ

হয়ে ফিরে এসেছে আমার কাছে। মনে পড়ে যাচ্ছে আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী প্রাক্তন বর্ষীয়ান ছাত্র পরলোকগত রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীকে যিনি বেঁচে থাকলে আজ সবচেয়ে বেশি খুশী হতেন। তাঁর কথা স্মরণ করে বেদনা বোধ করছি। মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত ও প্রকাশনার কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন যাঁরা তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। পাঠকগণ যদি এই গ্রন্থখানি পাঠ করে আনন্দ পান তবে তা-ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

পরিশেষে, গ্রন্থটির যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তার সব দায় আমার।

সূচিপত্র

সঙ্গীত ভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ'--এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে।.....উপযুক্ত স্বরভঙ্গির সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে সবটুকু কথা বলা হল কিনা এ বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। সঙ্গীত সুখী আনন্দময় আবেগাপ্লুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশের এক মাধ্যম; আবার দুঃখী, বেদনার্ত শোকার্ত চিত্তেরও একপ্রকার অভিব্যক্তি যা সপ্তস্বরের মায়াজালে আপ্লুত। কিন্তু শুধু এই নয়, প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী অসহিষ্ণু মনেরও সুরারোপিত অভিব্যক্তি সঙ্গীত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত শব্দটির মধ্যে অনেক গভীরতর অর্থের ব্যঞ্জনা সংগুপ্ত আছে বলে মনে হয়।

বিশ্বসংসারের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলেছে এক ধ্বনির অনুরণন—ওঁ। এই 'ওঁ' ধ্বনিই সপ্তস্বরের জন্মদাত্রী। আমাদের বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে সকল ধ্বনি ধরা পড়ে তা ওই সপ্তস্বরের দ্বারাই পরিপুষ্ট। কিন্তু তদতিরিক্ত যে ধ্বনিপ্রবাহ অবিরত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভাসমান রয়েছে তাকে বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সর্বদা ধরা যায় না, তার জন্য চাই সাধনা। সেই সাধনার বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিহিত ধ্বনি বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়েরই অতীত যে শ্রবণশক্তি সেখানে ধরা পড়ে। তাই আমাদের গান বা স্বপ্তসুরারোপিত সঙ্গীত ওই ইন্দ্রিয়াতীত সুরলহরীর সমগীত—তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করাই একনিষ্ঠ গায়কের আন্তরিক বাসনা। গায়ক যখন কণ্ঠে তার সপ্তকের 'সা' লাগান তখন যথার্থ সাধনার দ্বারা যদি নিখুঁত স্বরটিকে আয়ত্ত করতে পেরে থাকেন তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিহিত স্বরলহরীতে লাগে অনুরণন আর তখনই সাধক গায়কের তারসপ্তকের 'র্সা' তানপুরার তারসপ্তকের 'র্সা' তারে অনুরণন তোলে আপনা হতেই। তখনই সাধক গায়ক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সমগীতে হন মগ্ন। সেই মুহূর্তে তিনি ধ্যানমগ্নতায় শুনতে পান বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত নিরন্তর প্রবহমান এক অনন্ত সুরলহরী, মগ্ন হয়ে যান এক অচিন্তনীয় আনন্দের জগতে যেখানে সুরহীন বলে কিছু নেই। আর তখনই গায়ক গাইতে পারেন,

আমি আকাশে পাতিয়া কান
শুনেছি শুনেছি তোমারই গান।

এই একই অনুভূতি থেকে কবি-প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গের গান' শীর্ষক রচনায় বলেন, "শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে । কেবল বধির তাহা শুনিতে পায়

না। পৃথিবীর পাখির গানে পাখির গানের অতীত আর একটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে।"

এই কারণে সঙ্গীতের সাধক যাঁরা তাঁরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। আর ঠিক ওই একই কারণে সঙ্গীতসাধক তানসেনের দীপক রাগিণী গাওয়ায় অগ্ন্যুত্তাপে প্রকৃতি ঝলসে যায় আর মেঘমল্লারের বর্ষণে প্রকৃতি শীতল হয়। সমগীতভাবাপন্ন না হলে ব্রহ্মাণ্ডে লীন ধ্বনির মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া জাগানো কি সম্ভব? সামগানে বলা আছে প্রথম স্বরে মনুষ্য, দ্বিতীয় স্বরে গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ, তৃতীয় স্বরে পশু, চতুর্থ স্বরে পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণী, পঞ্চম স্বরে অসুর ও রাক্ষসগণ, ষষ্ঠস্বরে বৃক্ষলতাদি প্রীত হয়। অর্থাৎ সুরের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সুরেরই মাধ্যমে অনন্তকে উপলব্ধি সম্ভব হয়। সে কারণে সামবেদেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীতসাধক ঈশ্বরের নিকটবর্তী।

এ তো গেল বাহ্যধ্বনির অতিরিক্ত ধ্বনিপ্রবাহের সঙ্গে সমতা রক্ষার প্রসঙ্গ। এইবার বাহ্যধ্বনির সঙ্গে সমতা রক্ষাও কিন্তু সমগীত অর্থাৎ সঙ্গীত। যেমন পাখির কলকাকলি, নদীর কলতান, বিভিন্ন প্রাণীর উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে গায়কের সমতা রক্ষা করতে হয়। পাখির কলকাকলিও কিন্তু অনন্তের ধ্বনিপ্রবাহকে ধরারই চেষ্টা। গায়ক আবার আপন সুরে পাখির সেই কাকলিকেই ধরার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে যেন একটা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মানতা আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সঙ্গীত একের গান—একলার গান; কিন্তু তা কোণের এক নয় তা বিশ্বব্যাপী এক।" সেই কারণে গায়ক গেয়ে ওঠেন,

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি
ভুবনখানি—

এ দেখা তো বাহ্যেন্দ্রিয়নির্ভর নয়, অনুভবনির্ভর, ব্রহ্মাস্বাদের মতো, তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখা বা উপলব্ধি করা। ঠিক এই কারণের জন্যই আমাদের সাহিত্যে একেবারে প্রাচীনকাল থেকে সঙ্গীতের আধিপত্য অনস্বীকার্য; কারণ অলৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত সুরারোপিত মাহাত্ম্যগান শুধুমাত্র মুদ্রণযন্ত্রের অভাববশত বা মুদ্রিত গীতপুস্তকের অভাবজনিত নয়, দেবদেবীর কথা গানের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করতে হয় তবেই তাঁদের অলৌকিক কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করা যায়। যেখানে কথার শেষ সেইখানেই সুরের শুরু। মানুষের জীবন কেবলমাত্র কথার পিঠে কথা গেঁথেই শুরু ও শেষ হতে পারে, কিন্তু অলৌকিক কাহিনীকে বর্ণনা করতে হলে চাই সুর, চাই সঙ্গীত যা অধ্যাত্ম-সাধনার অন্যতম সোপন।

কিছুকাল আগে এক তান্ত্রিক সাধিকা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমার বাড়িতে শোবার ঘর, বসার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর সবই যখন আছে তখন পূজার ঘর নেই কেন? আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, প্রয়োজন বোধ করি না। আসলে আমি যখন

গান গাই তখন আমার মগ্ন অন্তরে যে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় তা-ই ঈশ্বরের যথার্থ পূজা বলে আমি মনে করি, তার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ফুল-জল-বাতাসা দিয়ে স্বতন্ত্র ঘরে লোকচক্ষে প্রমাণ রেখে ঠাকুরপূজা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। গান গাইবার সময় আমার চিত্ত থাকে শুদ্ধ, আর সেই শুদ্ধ চিত্তেই তো ঈশ্বরের নিঃসন্দেহে অবস্থান, নয় কি? সাধিকা অবশ্য এর পরে আর কোনও কথা বলেননি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন যে, এ যদি তোমার উপলব্ধিজাত সত্য হয় তবে তুমি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু সকলের তো এমন উপলব্ধি হয় না, তাই পৃথকভাবে আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন থাকে।

আমার এই যে ব্যাকুলতা—এ কিসের? কার জন্য ব্যাকুলতা? কেনই বা ব্যাকুলতা? আমার চিত্ত ব্যাকুল হয় সুন্দরের স্পর্শ পেতে, আনন্দময়কে উপলব্ধি করতে, সুখের মুহূর্তে, আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে পরমানন্দের নিকটবর্তী হতে আর দুঃখের চরম মুহূর্তে অন্তরে অবরুদ্ধ অশ্রুর আবেগ দিয়ে পরম করুণাময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করতে—এ ব্যাকুলতায় নিজেকে উজাড় করে দিতে পারলেই জীবন হয় ধন্য—সেই মুহূর্তে বিশ্বসংসার, পার্থিব সুখ-দুঃখ, দাবি-দাওয়া সব হয়ে যায় তুচ্ছ, সমস্ত চিত্ত যেন পূজার ফুল হয়ে পরমারাধ্যের চরণে নিবেদিত হয়।

সঙ্গীত সুরের তো বটেই, বাণীরও বাহক। সুর ও বাণী—শব্দ দুটি নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ বলেন, সঙ্গীতে সুরেরই অগ্রাধিকার, কথা তার পশ্চাদনুসরণ করে মাত্র; কেউ বলেন কথাই সুরকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় তার ঈপ্সিত জগতে, কথা ছাড়া নিছক সুরের কোনও আবেদন নেই। এর কোনও মতটিই শতকরা একশো ভাগ সত্য নয়। সাহিত্য যেমন বাগর্থের হরগৌরী মিলনে উৎকর্ষ লাভ করে, সঙ্গীতও তেমনই সুর ও বাণীর মিলনেই সিদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন,"সঙ্গীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। ভাবের সঙ্গে সুরের মিশ্রণই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। গান শুধু সুর নয় সুরের সঙ্গে কথার মিলনেই তার পূর্ণতা; বিচ্ছেদে নয়।" কেবলমাত্র সুর—তারও আবেদন আছে বইকি। যখন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজে—সেতার, বেহালা, বীণা, সরোদ, এস্রাজ, বাঁশি—তখন বাণী কোথায়? শুধুই তো সুর এবং সেই সুরের লীলায়িত প্রবহমানতায় আমরা মগ্ন হয়ে পড়ি, সমস্ত জগৎ সংসারকে ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হই। সুতরাং শুধু সুর একাই চিত্তকে হরণ করার পক্ষে যথেষ্ট। আবার কবিতার কথা তার অন্তর্নিহিত অর্থের গভীরতায় গভীরতম অন্তরদেশকে স্পর্শ করে যায়, তার ব্যঞ্জনায় চিত্ত হয় উদ্বেলিত, কবির ব্যবহৃত নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছ তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় এক ভাবরাজ্যে। আর সে কারণেই যেখানে সুর ও কথায় সমন্বয় ঘটে সেখানেই ভাবের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, সেখানেই শিল্প অসামান্যতায় পৌঁছে যায়। শিল্প তখন একদিকে সুরের ইন্দ্রজাল তৈরি করে, আর একদিকে বাণীর সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে—আর তখনই তো গায়কের সমস্ত অন্তরকে মথিত করে প্রস্ফুটিত হয় গানের কলি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথা ও সুর' গ্রন্থে বলেছেন, "গানে কথা অর্থাৎ কবিতা চাই। সেই কবিতার ভাবার্থ নিয়ে সুর বসাতে হবে।....সুরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে

তোলা।....কবিতা মনের এক স্তরের, এক ধরনের ভাব সমাবেশের ভাষা, সুর অন্য স্তরের। প্রকাশ করবার প্রবৃত্তির ভিত্তি ছাড়া এ দুই ভাষার কোন প্রাথমিক সম্পর্ক নেই। ....এ দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী, অথচ একই শুচিবাইগ্রস্ত মনোভাবপ্রসূত মতের মাঝামাঝি আর একটি মত।....সুর ও কবিতা হরগৌরী মতন অঙ্গাঙ্গীভাবেই মিলিত রয়েছে, সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটি না-কেবল সুরের, না-কেবল কবিতার, অথচ দুইয়ের মিলনে একটি অতিরিক্ত ফল। তার ভিন্ন নাম দেওয়াই ভালো—সঙ্গীত।''

সঙ্গীতে অতএব সুর এবং কথা উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। বিশেষ বিশেষ সুরের প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ বাণীর যেমন অপেক্ষা করে, বিশেষ বিশেষ বাণীও তেমনই বিশেষ বিশেষ সুরের জন্য অপেক্ষমানা হয়ে থাকে। অবশ্য সঙ্গীতের বাণীকে হতে হবে বস্তু-অতিক্রমী। বাণী যদি নিছক বস্তুগ্রাহ্য হয় তবে সূক্ষ্মকলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার কোনও কদর নেই। বাণী যত সূক্ষ্ম, গভীর আবেগসম্পন্ন, ব্যঞ্জনাধর্মী, মধুর হবে, সঙ্গীতে ততই তার সমাদর। সেই কারণে যে শব্দ অধিকতর সূক্ষ্ম ও গভীরার্থবোধক সেই শব্দ তত বেশি গীতের সহায়ক, সুর রচনার উপযোগী।

কথা ও সুরকে আশ্রয় করে থাকে গীতিকবিতা। কিন্তু যেখানে শুধুই কথা অর্থাৎ কেবল কবিতা সেখানেও আমরা তার গূঢ় ভাবটিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি; আবার যেখানে কথা ও সুর উভয়েই প্রধান সেখানেও কথার অন্তরালে যে গূঢ় ব্যঞ্জনা বা ভাব তাই-ই প্রধান হয়ে ওঠে। বস্তুত ভাবকে পরিস্ফুটনের জন্যই বাণীর প্রয়োজন এবং বাণীকে হৃদয়বেদ্য করে তুলতে বাণীর গায়ে সুরের অবলেপন। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলতে হয় ''আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপেই দেখিতে চাই। সঙ্গীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা।''

গানের বাণীর মধ্য দিয়ে গায়ক বা রচয়িতা কী বলতে চান? প্রায় সমস্ত গানেরই বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর, সৌন্দর্য, মঙ্গল ও সত্য। কোথাও কোথাও সামাজিক নানা কার্যকলাপও গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তবে সেগুলি যথার্থ সঙ্গীত বলতে যা বোঝায় তা নিশ্চয়ই নয়। প্রেম—মানবপ্রেমও যেমন হতে পারে, ঈশ্বরপ্রেমও তেমনই হতে পারে। প্রেমের সঙ্গেই ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে সৌন্দর্য ও সত্য এবং সেই অর্থে মঙ্গলও। তাই প্রেমমূলক সঙ্গীতের ভাষা মধুর, পেলব, সৌন্দর্যব্যঞ্জক, আত্মনিবেদনমূলক। গায়ক এবং রচয়িতার মধ্যে প্রেমবোধ না জন্মালে যথার্থ প্রেমসঙ্গীত গাওয়া অথবা রচনা করাও সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, এই প্রেমবোধ নিছক জাগতিক হলে তার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ন থাকে না। জাগতিক মানব-প্রেমকে বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলেই তার সীমাহীন সৌন্দর্য অনুভব আর তারই মাধ্যমে অসীম ও অনন্তের নাগাল পাওয়া সম্ভব—

সঙ্গীতের বাণী পথে
ছন্দে গাঁথা তব নমসকৃতি
জাগালো অন্তরে মোর
প্রেমরসে অভিষিক্ত গীতি।
বসন্তে কোকিল গাহে
অলক্ষিতে কোন্ তরুশাখে
দূর অরণ্যের পিক
সেই সুরে তারে ফিরে ডাকে।

বসন্তের কোকিল আর দূর অরণ্যের পিক কিন্তু বিশ্বব্যাপ্ত সুরলহরীকেই আপন আপন কণ্ঠে ধরার চেষ্টা করে আর তারই মধ্য দিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তাকেই নমস্কার জানায়। কবি যখন রচনা করেন—

তোমায় গান শোনাব তাই তো
আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক'
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে—
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি
থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে
তুমি যাও যে সরে—
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।

এই 'ঘুম-ভাঙানিয়া' 'দুখ জাগানিয়া'কে কবি বলেন, কবির জীবনব্যাপী কাজের মাঝে কোনও বিরাম নেই, সারা দিনের শেষে পাখি তার নিজের নীড়ে ফিরে আসে, বিশ্রাম পায়, কিন্তু হে আমার 'দুখ জাগানিয়া', হে আমার 'ঘুম ভাঙানিয়া' আমার জীবনে তোমার পরশ লেগেছে বলেই আমার প্রাণ তোমার সুধাপরশে ধন্য। মানুষ সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ আর তাই ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা ও সম্ভাবনা এবং ঈশ্বরকরুণা বর্ষিত হবার সম্ভাবনা তারই ওপরে সবচেয়ে বেশি। সেখানেই মানব ক্ষুদ্র প্রাণীকে অতিক্রম করে, আর তাতেই তার জীবনের সফলতা। ঈশ্বরের সঙ্গলাভ করেই তো মানব-অন্তর, মানব

অঙ্গ পুণ্যস্পর্শ পায়, অন্তরে সৌরভ জাগে, সুন্দরের আরাধনায় চিত্ত হয় রঞ্জিত আর এমনি করেই প্রতি মুহূর্তে পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে নবীন দেখা দেয়, এমনি করেই এই 'জনমে'ই জন্ম-জন্মান্তর ঘটে। কবির এই দার্শনিক ভাবানুভূতি প্রকাশের জন্য ভাষাকেও তো ব্যঞ্জনা-গভীর হতে হবে, 'লভিনু', 'মন্থর', 'সৌরভ', 'পরশ', 'রঞ্জিত', 'সঞ্চিত', 'জনম' প্রভৃতি মধুর পেলব কাব্যভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছে আর তারই সাহায্যে অনির্বচনীয়কে প্রাপ্তির যে পরিতৃপ্তি তা ধরা পড়েছে। গীতের ভাষার এখানেই বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "....সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সঙ্গীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিক বায়ুমণ্ডলের মতো। ....বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। বাক্ অবাক্ বাঁধা পড়ে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাকের একান্ত মিলনেই কাব্য।" সঙ্গীত আসলে কাব্যেরই সুরারোপিত রূপ। সঙ্গীতেও তাই ছন্দ অপরিহার্য আর তাকেই বলে লয়। যে লয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা পড়ে আছে, অবিরত প্রবাহিত হয়ে চলেছে একই গতিতে, গতি ভাঙলেই বিপর্যয়, সেই লয়ই সঙ্গীতকে ছন্দে বেঁধেছে। বাণী, সুর, ছন্দ বা লয় একত্রে মিলিত হয়েই সঙ্গীতের জন্ম দেয়। Websters Encyclopaedic Unabridged Dictionary -তে তাই 'Music' অর্থে বলা হয়েছে— Music "an art of sound in time which expresses ideas and emotions in significant forms through the elements of rhythms, melody, harmony, and color."

বাঙ্গালীর সঙ্গীত সংস্কৃতি

কথায় বলে, যে মানুষ গান ও ফুল পছন্দ করে না সে খুনও করতে পারে। অর্থাৎ গান মানুষের চরিত্রের আদিমতম নৃশংসতাকে প্রশমিত ক'রে তাকে শুচিশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। প্রাচীনকালের বর্বর মানুষ স্বরের নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের মনোভাবকে প্রকাশ করত যাকে বলা হয় Primitive Music। সেই বর্বর মানুষ ক্রমশ সভ্য হয়ে উঠল তার সঙ্গীত-শিল্পকলার আবিষ্কারে। সঙ্গীত মানুষের জন্ম-মৃত্যু, মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখকে ঘিরে নিয়ত বহমান। কেননা বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই বলতে হয় সঙ্গীত মানুষের স্বভাবজাত। এমন হতে পারে, কোন কোন জাতির সঙ্গীতপ্রিয়তা অন্যদের তুলনায় বেশি। সেক্ষেত্রে জাতির অন্তরেই গীতিভাবুকতা থাকে পরতে পরতে—দেশজ প্রবণতাই তার কারণ। রুক্ষ শুষ্ক মরুভূমির দেশের মানুষ জীবনসংগ্রামেই থাকে সদাব্যস্ত। তাই তাদের সঙ্গীতের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ধরনের হতেই পারে। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের নরম ভূ-প্রকৃতিতে জাতি গড়ে ওঠে গীতিপ্রবণ হয়েই। সঙ্গীত সেখানে চেতনার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। প্রখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু বলেছিলেন ঃ

"যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলেনা....মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহু কালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জ্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢব, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন—...যে দেশে দিনভিখারী ও রাতভিখারীও গান না গাইলে ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?"

সমাজ ও জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও পরিবর্তন হয়েছে। বৈদিক যুগে গীতচর্চা ছিল মূলতঃ সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধযুগে তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে উচ্চবর্ণের হাত থেকে শাসনবিধি ক্রমশ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এল। ফলে সেকালের সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য যোগ গড়ে উঠল। বৈদিক যুগে ছিল সামগান, বৌদ্ধযুগে সঙ্গীতে দেশজ সুরের মিশ্রণ ঘটল, গুপ্তযুগে তা আরো বিস্তৃত হল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাসকদলের পরিবর্তন ঘটেছে ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশে। মোগলযুগে মুসলমানি গীতধারার প্রকাশ ঘটল খেয়াল ঠুংরীর মধ্যে দিয়ে, গজল গানে হল প্রেমগীতির সূচনা। কিন্তু এ সব গানই রাজদরবার কেন্দ্রিক। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ কোন কিছুর আয়ুষ্কালই দীর্ঘ হয়না অথবা সাধারণ মানুষের আত্মপ্রকাশের বাসনা থেকেই পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে ভিন্নতর সাঙ্গীতিক জগত। এরপরে ইংরেজ

আগমন —দেশের জনজীবনে সবক্ষেত্রেই ঘটল চমকপ্রদ পরিবর্তন। ইংরাজীয়ানা জীবনের সবক্ষেত্রকেই ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল, বাদ গেল না শিল্প-সাহিত্যের জগতও।

প্রাচীন বাংলা গানের নিদর্শন হিসাবে চর্যাগীতি, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, কীর্তন, নিধুবাবুর টপ্পা, কবিগান, পাঁচালি, খেউড়, তর্জ্জা, যাত্রার গান প্রভৃতিকে ধরা যায়। বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ জাতি। তাই প্রাচীন বাংলাগানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাস কিংবা কোন বিশেষ দেবদেবী জায়গা জুড়ে বসেছিলেন। সেকালে যেন 'কানু বিনে গীত নাই।' এ সব গানেই রীতিমত রাগরাগিণীর ব্যবহার করা হয়েছে যা অনেকক্ষেত্রে আজকে আর আমরা জানিই না। চর্যাপদ ত আসলে চর্যাগীতিই যেখানে বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার নানা জটিল আচার-আচরণকে সন্ধ্যাভাষার সাহায্যে গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের জীবনই সেখানে মুখ্য অবলম্বন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছিলেন ঃ

"ভারতীয় সংগীত কেবলই মানসিক আনন্দ ও ভাববিলাসের সামগ্রী নয়, অধ্যাত্মসাধনারই তা পরিপূর্ণ প্রতীক।"

ভারতীয় সঙ্গীত প্রধানত অন্তর্মুখী, সঙ্গীতের সাধনা সেখানে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের সহায়ক। বাংলাদেশে এই বিশেষত্ব আরো বেশী করে ধরা পড়ে তার ধর্মপ্রবণতার কারণে। পার্থিব জীবনের জরামৃত্যু অতিক্রম করে নির্বাণ লাভের বাসনা প্রতিটি মানুষের। বাঙ্গালী জীবনের নানা সুখদুঃখ, যন্ত্রণা-বেদনার মধ্য দিয়ে সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ওইসব গানে অভিব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাহ্যত আদিরসাত্মক রচনা হলেও মূলে আছে ঈশ্বর বা আরাধ্য কৃষ্ণ ও ভক্ত শ্রীরাধার প্রেমব্যাকুলতা। নামের মধ্যেই 'কীর্তন' শব্দটি যুক্ত হয়েছে যা মাহাত্ম্যবর্ণনা অর্থে ব্যবহৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানেও রাগ-তালের নির্দেশ ছিল। এই কাব্যটিকে বলা হত 'নাটগীতি পাঞ্চালিকা'। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বৈষ্ণব প্রেমগীতি। এই মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর ভাবসৌন্দর্য, ভাষাসৌন্দর্য, প্রকাশভঙ্গী, উপমা-অলংকার মিলেমিশে কাব্য ও সঙ্গীতের এক অনুপম যুগলমিলন তৈরী করেছে। কাব্য ও সঙ্গীতের এই মিলন পরবর্তীকালের বাংলাগানেরও বিশিষ্টতা। মঙ্গলকাব্যগুলিও দেবদেবীর মহিমা কীর্তন। সঙ্গীত উচ্চমার্গ থেকে ক্রমশ সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছল। ভয়ে ভক্তিতে প্রচণ্ড রাগী বিভিন্ন দেবদেবীর মহিমাকীর্তন করতেই হয়েছে নিরাপত্তাহীন মানুষদের দৈবকৃপা লাভের আশায়। এইসব গানেও নানাধরনের বাদ্যযন্ত্র—বাঁশী, মন্দিরা, করতাল, রবাব, দোতারা, সেতার, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ব্যবহৃত হ'ত।

বাংলাদেশে চৈতন্য আবির্ভাবের পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন মাত্রা পেল। কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলী কীর্তন গানরূপে প্রচার পেল। এও ভক্তিগীতিই। রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক এক নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার সুগভীর ব্যঞ্জনাই এই কীর্তন গানের মূল। রাগরাগিণী তাল সহ ছোট ছোট গীতিকবিতা এগুলি। স্থানানুসারে গরানহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটী, মান্দারনী, ঝাড়খণ্ডী প্রভৃতি নামে কীর্তন পরিচিত। দল বেঁধে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমবেতকণ্ঠে গাওয়া কীর্তনকে বলা হয় 'সঙ্কীর্ত্তন' বা 'নামকীর্তন'। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নিয়ে 'রসকীর্তন' বা 'লীলাকীর্তন' করা হয়। কোন সাধক বা

ভক্তের দেহাবসানে গাওয়া হয় 'সূচক কীর্তন'। এ গানে দুঃখের ভাবটিই গুরুত্ব পায়। আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমানুরক্তি 'গৌরাঙ্গবিষয়কপদ' বা 'গৌরচন্দ্রিকা'র জন্ম দেয়। কাব্যসঙ্গীত হিসাবে কীর্তন অতুলনীয়। জনজীবনে সংযম ও শুদ্ধরুচি তৈরী করার ব্যাপারে কীর্তনের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং আছে। কীর্তনের মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষের মহামিলন সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন চৈতন্যদেব। গান সেখানে বিরাট এক সামাজিক প্রয়োজন সাধনের সহায়ক হতে পেরেছিল এ বড় কম কথা নয়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজ আগমনে বাংলাদেশের সামগ্রিক পটপরিবর্তন ঘটে। প্রথম পর্বে জাতি কিছুটা আত্মহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত। এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি সত্যই কঠিন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রেরই কথায় সাহিত্যের প্রাঙ্গণ যেমন কখনো শূন্য থাকে না, সঙ্গীতেরও তাই। আর সেকারণেই এই সময় শোনা গেল আখড়াই, কবিগান, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি গান। গায়কেরা আখড়ায় অনুশীলন করতে যেতেন বলে নাম হয়েছিল 'আখড়াই'। দীর্ঘ অনুশীলনের পর আসরে গান গাইবার অধিকারী হতেন গায়ক। বাদ্যযন্ত্র কম ব্যবহার করা হ'ত , সুরের পারিপাট্যও অনেক কম। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আখড়াই গানের প্রচলন ঘটে। এবে 'বৈঠকী গান'ও বলা হ'ত। রীতি মেনে প্রথমে ভবানীবিষয়ক গান, তারপর খেউড়, তারপর প্রভাতী গাওয়া হ'ত। শব্দ ব্যবহার ছিল মার্জিত। গায়কদের রুচিবোধের প্রশংসা করতেই হয় একারণে যে, রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে রাগরাগিণীর পরিবর্তন ঘটত এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাদ্যযন্ত্রেরও। গানের সঙ্গে যন্ত্র হিসাবে প্রধানত হাঁড়ি-কলসীর ব্যবহার ছিল যদিও বেহালা, জলতরঙ্গ, মন্দিরা, বীণা, বাঁশি, ঢোল প্রভৃতিও জায়গা করে নিয়েছিল।

এরপরে এল কবিগান। কবিগান কোন সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রমাণ না হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় গান ছিল। ইংরেজশাসিত কোলকাতায় শ্রমজীবী মানুষের বিকৃত রুচি ও স্থূল চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল কবিগান। গান হিসাবে একান্তই স্থূল — চাপান-উতোরে দুইপক্ষের পারস্পরিক লড়াই-এর মাধ্যমে একপক্ষের জয়লাভের বিষয়টি এখানে মুখ্য। ফলে দুইপক্ষ প্রতিযোগিতায় নেমে শালীনতার মুখ রক্ষা করার প্রয়োজন সবসময় জরুরি বলে মনে করে নি। গায়কদের 'কবিওয়ালা' নামে চিহ্নিত করা থেকেই বোঝা যায় তাদের সম্পর্কে শ্রোতাদের মনোভাব কী ছিল। তবে সবক্ষেত্রে তা বলা যায় না। অশিক্ষিত পটুত্ব এইসব গায়কদের বিশেষ গুণ হলেও পুরাণাদি ও সঙ্গীতবিষয়ক শাস্ত্রচর্চা এদের করতে হত। ফলে উৎকৃষ্ট কবিগান রচয়িতারা শুধু প্রতিযোগিতার নোংরামিতেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না, তাঁরা আগমনী-বিজয়ার মত শাক্তগীতিও রচনা করে পরিতৃপ্ত হতেন। তাছাড়া আগমনী-বিজয়ার বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের আন্তরিক সংযোগ ছিল বলে সে গান মর্মকে স্পর্শ করত।

যাত্রা, পাঁচালী, তর্জা, হাফ-আখড়াই ইত্যাদিও সেযুগের গানের প্রবাহকে টিকিয়ে রেখেছিল। যাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় আসর ছিল। বিভিন্ন পৌরাণিক পালা শুনে শুনে অশিক্ষিত মানুষেরা পুরাণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করত। তাছাড়া গান ছিল অন্যতম আকর্ষণ।

অভিনেতারাই গান গাইতেন মনপ্রাণ দিয়ে, শ্রোতারা অভিভূত হত।

দাশুরায়ের পাঁচালী ছিল মনোরঞ্জনের আর এক উপায়। পুতুলনাচের মধ্য দিয়ে পুরাণ, ইতিহাস ও সমাজকে তুলে ধরা হত। কিছু পরিমাণে আদিরসের জোগান এসব গানেও ছিল যা সামাজিক অবক্ষয়েরই প্রমাণ দেয়। হাফ-আখড়াই আখড়াই এর চেয়ে নিম্নমানের রচনা। আখড়াই এর মত জটিল রাগরাগিণীর ক্রীড়ানৈপুণ্য থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে হাফ-আখড়াই-এর সৃষ্টি। তবে এ গানও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। অধিকাংশ অশিক্ষিত মানুষ শাসক ইংরেজের অধীনে দিনভর পরিশ্রম করে কোন তত্ত্বকথা শুনতে চাইতেন না, তাই রগরগে এসব গানের চল ভালই ছিল। তর্জায় নাচ ও গান একইসঙ্গে থাকত। অনেক বেশি স্থূলরুচির বাহক এই তর্জা।

অষ্টাদশ শতকেই বাংলাদেশে যে গীতধারা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা শাক্তগীতি। ১৬টি পর্যায়ে এই গান বিন্যস্ত হলেও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল আগমনী-বিজয়া গান। গৌরীদান প্রথায় আটবছরের কন্যাটিকে বিবাহ দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে মায়ের প্রাণ কাঁদত কন্যার জন্য। বৎসরান্তে একটিবার তাকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে আনার জন্য হিমালয়ের কাছে মা মেনকার কাতর প্রার্থনা। অতঃপর চারটি দিনের জন্য কন্যার আগমন, দশমী প্রভাত হতে-না-হতেই বিদায়ের করুণলগ্ন সমুপস্থিত। এই ঘটনা ত পুরাণকথা নয়, এ যে অষ্টাদশ শতকের প্রতিটি পরিবারের ঘরে ঘরে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনা। সামাজিক এই প্রথাকে আশ্রয় করে আগমনী-বিজয়া গানে তাই রচয়িতারও যতখানি আন্তরিকতা, শ্রোতারও তাই। প্রধানত শাক্তগীতি 'সাধনগীত'-ই ছিল। মা ও ছেলের সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তন্ত্রসাধনার নানা জটিল তত্ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে এই গানে। শাক্তসাধক মনকে বিষয়াসক্তিমুক্ত করেই আরাধ্যকে পেয়ে থাকেন। শ্রীঅমরেন্দ্র রায় বলেছিলেন :

"বৈষ্ণব প্রেমগীতির ন্যায় শক্তিবিষয়ক সঙ্গীতেও বাংলার আকাশ, বাতাস মুখরিত হইয়াছে।....ইহার কাব্য সৌন্দর্যও উপেক্ষণীয় নহে।"

শাক্তগীতিতেও রাগরাগিণীর ব্যবহার ছিল। তবে রাগের জটিল রূপটি সেখানে সবসময়ই চাপা পড়ে আছে দেশজ সুরের বা প্রসাদী সুরের আবেশে।

বাংলা কাব্যসঙ্গীতের জগতে বিপুল জোয়ার আনে পাঞ্জাবী টপ্পার বাংলা সংস্করণ যার প্রবর্তক ছিলেন রামনিধি গুপ্ত। দেশীয় আবহাওয়া ও ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়ে নিধুবাবু তৈরী করলেন বাংলা টপ্পা গান যা আয়তনে ক্ষুদ্র তবে ভাবগভীরতায় অসামান্য। প্রেমই এ গানের মুখ্য উপজীব্য। কথার খেলা টপ্পাগানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বৈঠকী আসরে গাওয়ার মতই জমাটি এই গান। জমিদার অথবা ধনীব্যক্তিদের বাড়িতে আসর করে এ গান গাওয়ানো হত। টপ্পা গাওয়ার জন্য মার্গসঙ্গীতের প্রথামাফিক চর্চা আবশ্যিক ছিল। আজও এর প্রচলন আছে। খুব সাম্প্রতিক কালে টপ্পা শেখার আগ্রহ গায়কদের মধ্যে বেড়েছে। প্রেম ছাড়াও দেশীয় ভাষা সংস্কৃতিও টপ্পার বিষয় হত। প্রসঙ্গত নিধুবাবুর 'নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশীভাষা পুরে কি আশা' গানটির কথা স্মরণ করা

যেতে পারে। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছিলেন তৎকালীন 'টপ্পা দমন আন্দোলন'-এর কথা। নিতান্তই প্রেম সঙ্গীত বলে সেকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলনের জোয়ারে টপ্পা স্থানচ্যুত হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করতে চাইলেন এবং সে উপাসনার জন্য জরুরী হয়ে পড়ল ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রহ্মসঙ্গীত সমস্ত মোহ-সংস্কারকে দূর ক'রে মানুষকে দার্শনিক উপলব্ধি ও নান্দনিক চেতনার জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছিল। এই গানের সঙ্গে ধ্রুপদের আঙ্গিকগত কিছু মিল লক্ষ করা যায়।

বাংলার বাউলও শুধু বাংলার নয়, আজ বিশ্বের শ্রোতার মনোযোগ কেড়েছে। বাংলাদেশে বৈষ্ণব-শাক্ত-বাউল সাধনা পাশাপাশিই চলেছিল। বাউলরা ঈশ্বর-প্রেমে বাতুল অর্থাৎ পাগল। বাউল গানে দেহসাধনার মধ্যে দিয়ে ধর্মসাধনার কথাও বলা হয়েছে। ভাষা ব্যঞ্জনাধর্মী, উপমাসমৃদ্ধ। মুসলমান বাউলও সংস্কারবর্জিত মনে বাউল গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

"বাউলের সুরে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের গা ঘেঁষে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোন রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।"

প্রসঙ্গত লালন ফকিরের কথা না বললে চলে না। ইনিও গানকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির সাধনার উপায় হিসাবেই দেখেছিলেন। এই বাউল বা ফকিরি গান মূলত একতারায় গাওয়া হয়। এ যেন ঈশ্বর প্রাপ্তির একটি লক্ষ্যেই মনকে স্থির রাখা—সহজ সরল অভিব্যক্তি। বাউল গান মনকে উদাস করে দেয়, ইহজীবনের মায়া-মোহকে মিথ্যা বলে বুঝতে শেখায়।

এসব ছাড়াও, প্রতিদিনের জীবনাচরণে পাঁচালির মত মুখে মুখে প্রচারিত হত ঘুমপাড়ানির গান, ব্রতের গান, চিঁড়েকোটার গান, ধানভানার গান, বিয়ের গান, তাঁতবোনার গান, কৃষিবিষয়ক গান প্রভৃতি। বাঙ্গালীর জীবনাচরণের যে-কোন পর্যায়েই আপন আপন সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, নিদ্রা-জাগরণ ও শ্রমকে মনে রেখে তারা গান রচনা করেছে জীবনকে অধিকতর উপভোগ্য করে তুলতে, আনন্দকে পরমতমরূপে গ্রহণ করতে, শোককে গভীরতর ক'রে উপলব্ধি করতে। বাঙ্গালীর স্বভাবের স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি তাই গানেই ঘটেছে।

এই সমস্ত লোকসঙ্গীতের ধারা যখন বহমান তখনও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বাংলাদেশ থেকে যে একেবারে লুপ্ত হয়েছিল, এমন নয়। মার্গসঙ্গীত বাংলায় 'খেয়াল' নামে পরিচিত। তারই পাশাপাশি চলেছিল ঠুংরী, টপ্পা। হিন্দুস্থানী গান ভেঙ্গে বাংলা ঠুংরী ও বাংলা টপ্পার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। এককথায় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় বাংলার সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এই পরিবেশেই বাংলা গান মোড় নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, অবশ্যই পূর্বৈতিহ্যকে অস্বীকার না করে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল বাংলা গানের অপার বিস্ময়। যে গীতিকবিতার হাত ধরে বাংলা গানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, যে দেশজ অধ্যাত্মভাবনা যুগে যুগে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল, পূর্বোক্ত গীতিকারেরা তা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখেন নি। রবীন্দ্রনাথের গানে ত পূর্বের সঙ্গীতধারার বিপুল সমারোহ—টপ্পা, ধ্রুপদ, শক্তিগীতি, কীর্তন, বাউল, পল্লীগীতির সুর রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করেছিল। আবার দেশীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও বিদেশী সুরের প্রয়োগ রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে। এখানে সুরকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে মুক্ত মনের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তা অসামান্য। এ সত্য অন্যদের ক্ষেত্রেও কমবেশি প্রযুক্ত হতে পারে। লক্ষণীয় এই যে, এঁরাই এঁদের গানের স্রষ্টা, সুরকারও। প্রায় একই সময়ে বর্তমান থেকেও প্রত্যেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলেই বাংলা গান আরো বৈচিত্র্যে ভরপূর হয়ে উঠেছিল। এঁদের গান মনকে শুচি করে, অসংযত ভাবনা থেকে নিবৃত্ত করে, ঈশ্বরচেতনায় সমৃদ্ধ করে। পূর্বের ঐতিহ্যকে নিজেদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে রূপায়িত করে এঁরা সঙ্গীতজগতকে সমৃদ্ধ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান দেশী-বিদেশী সুরের মিশ্রণে তৈরী হলেও তাঁর বহু গান রাগাশ্রিতও। নানাধরনের গানের মধ্যে তাঁর দেশাত্মবোধক গানই অধিক জনপ্রিয়। সেকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ সঙ্গীতস্রষ্টাদেরও উদ্বেলিত করেছিল আর তারই ফলশ্রুতি বিভিন্ন সঙ্গীতস্রষ্টার দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলি। অতুলপ্রসাদের গানে মার্গসঙ্গীতের ছোঁয়া আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে আছে ঠুংরীর ঢঙ। সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ শ্রীসুধীর চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে সঙ্গীতপাগল অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌয়ে প্রচলিত 'লচা ঠুংরী' শিখেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদও একারণে কবি-গায়ককে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। তবে 'লচা ঠুংরীর' চলনকে হুবহু নয়, আলগাভাবেই গ্রহণ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজের গানে আর সেকারণেই তাঁর গানের সহজ স্বচ্ছন্দ সুরের আবেদন মনকে আপ্লুত করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতই অধ্যাত্মভাবনায় আত্মনিবেদিত অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে। অতুলপ্রসাদের গানে আছে অচঞ্চল মাধুর্য, ঐকান্তিক সংযম, আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা। ভাষা সহজ হলেও ভাবের গভীরতায় গান অন্তরকে স্পর্শ করে যায়। বাংলাগান যে মুখ্যত কথাশ্রিত, সুর যে কথাকে পূর্ণতা দেয়, গভীরতা দেয়— এই বিশেষত্ব অতুলপ্রসাদের গানে স্পষ্ট। মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত রীতিটি গুরুত্ব পায় বলে বাংলাদেশে সেই গায়নরীতির প্রচার কিঞ্চিৎ সীমিত ছিল, আজও হয়ত আছে। রজনীকান্তও আত্মসমাহিত কবি গায়ক। গান যেন তাঁর স্বতস্ফূর্ত রচনা। সেখানে শব্দ, ছন্দবন্ধ উপমা অলংকারাদির ব্যবহারে কোথাও আতিশয্য নেই। সহজ সুরের আবেদনেও ধরা পড়ে সহজতা। গান যে শুধু গাইলেই হয় না, 'শোনবারও প্রতিভা থাকা চাই'—রজনীকান্তের গান সেই ভাবমগ্নতায় পৌঁছে দেয় যা শোনার মত শ্রোতা পাওয়াও জরুরী। তাঁর আপন মনে

গাওয়া গান শ্রোতাকে স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট করে।

'লেটোর দলে' গান গাওয়া কাজী নজরুল ইসলাম সারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে তাঁর সঙ্গীতের মদিরা পান করিয়ে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিলেন, আজও রেখেছেন। কী বিচিত্র সুরে ও গানে ভরা সেই ডালি—রাগসঙ্গীত থেকে শুরু করে গজল, ভজন, কীর্তন, ভক্তিগীতি, স্বদেশী, শ্যামাসঙ্গীত, প্রকৃতি বিষয়ক গান, দুর্ভিক্ষের গান, ছাদ পেটানোর গান, নবীর গান, জারি সারি মুর্শিদা এমনকি আধুনিক গান পর্যন্ত রচনা করে বাংলা গানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। স্বতস্ফূর্ত রচনাশক্তি, দুর্নিবার আবেগোচ্ছ্বাস, দরদী কবিমন গানে যে সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে, নজরুলগীতির শ্রোতামাত্রেই তা জানেন। নজরুলগীতি এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে প্রথার বন্ধনকে স্বীকার করেনি বলে গায়ক সুরকে বহুল পরিমাণে আবেদনধর্মী করে ব্যবহার করতে পারেন। প্রমাণ, পণ্ডিত শ্রীঅজয় চক্রবর্তীর গাওয়া নজরুলগীতিগুলি। অবশ্য কম প্রতিভাবান গায়কের হাতে পড়লে একারণে সুরের অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও যথেষ্ট থেকে যায়। সেকারণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ থেকে উদ্যোগীদের সহায়তায় নজরুল সঙ্গীতের standard স্বরলিপি প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছে। গানে অজস্র রাগরাগিণীর ব্যবহার থাকলেও সঙ্গীত এখানে স্বতস্ফূর্ততা হারায় নি, রসের জোয়ার বইয়ে দিতে পেরেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দ্বিজেন্দ্রগীতি বাংলা গানের জগতে আর এক অবিস্মরণীয় সংযোজন যার গায়ক শ্রোতা আজ মুষ্টিমেয়। বাংলা গানে বিদেশী সুরের প্রয়োগ ও বৃন্দ গানের প্রবর্তক তিনি। আর রীতিমত 'বিলিতি' গান শিখে বিদেশী সুরের অসামান্য ছোঁয়ায় গানের যে শক্তি বৃদ্ধি ঘটে তা তাঁর গান থেকেই শেখা যায়। রাগভিত্তিক গানেরও অসদ্ভাব নেই। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও তাঁর সঙ্গীত কাব্যধর্মিতা থেকে বিচ্যুত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রগীতি গাওয়ার জন্য যে কণ্ঠ অনুশীলন, সুরের ওপর দখল একান্ত জরুরী তা ক্রমশ লুপ্ত হতে বসায় হয়ত এসব গানের চাহিদা কমে যাচ্ছে। আজকের গান সেকালের তুলনায় অনেক চটুল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গান, স্বদেশী গান, হাসির গান, প্রেমের গান বাংলা সঙ্গীতের ধারাটিকে প্রসারিত করেছিল।

পূর্বোক্ত গীতিকার সুরকার এমনকি গায়কেরাও দেশীয় সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিদেশী সুরের ব্যবহার করেছিলেন নিজের নিজের গানে। এই মিশ্রণ যাকে বলে 'সংমিশ্রণ', ওপর থেকে আলগা করে বা চমক সৃষ্টির জন্য জোর করে চাপানো নয়। ফলত, বিদেশী সুরের ব্যবহারটুকু স্বীকার করে নিলেও ওইসব বাংলাগানের আবেদনে কোথাও ঘাটতি ঘটে নি। বাংলা গানের সুরের মধ্যেও বাংলা ভাষার মতই যেন 'Elasticity' আছে, তাই বিদেশী সুরকেও সে অনায়াস দক্ষতায় আপন করে নিতে পারে। সেখানে কোন 'কৌশল' বা গোদা বাংলায় যাকে বলে 'কায়দা'—দেখানোর প্রয়োজন হয় নি। এই বোধশক্তি প্রত্যেক সুরস্রষ্টার ক্ষেত্রেই থাকা চাই যে, বিদেশী সুরটুকুকে দেশী সুরের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন বলে বোধ না হয়। আর হলেও তার শ্রুতিমাধুর্যে যেন শ্রোতার অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে 'showmanship'-এর যুগে ঠিক এর বিপরীতটিই ঘটে বলে বাংলা

গান তার চরিত্র হারিয়ে ফেলছে অনেক সময়।

পূর্বোক্ত গীতিকার ও গীতস্রষ্টাদের অসামান্য সাফল্যে এক সময় বাংলা গান গাইবার, শিখবার বিপুল আগ্রহ জেগেছিল। ঘরে ঘরে বাংলা গানের চর্চা বেড়ে যায়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাগানের ব্যবহার ঘটতে থাকে, গড়ে ওঠে অসংখ্য সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র, সঙ্গীত বিষয়ে পরীক্ষা ও ডিগ্রিদানের ব্যবস্থা হয়, সভা-সমিতি আনন্দোৎসব সর্বত্র বাংলা গান আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বহু নতুন নতুন সুরকার ও গীতরচয়িতা এলেন, গানের সৌন্দর্যবৃদ্ধির কারণে কেবলমাত্র হারমোনিয়াম বা তানপুরাই নয়—বহু নতুন নতুন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হল। আগে যেখানে কথাশ্রিত গানটিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যন্ত্র তার অনুষঙ্গ মাত্র ছিল, এখন সেখানে যন্ত্রের সহযোগে গান সুখশ্রাব্যতা পেল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব নাম আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁরা হলেন শচীনদেব বর্মণ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অজয় ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, বাণীকুমার, প্রণব রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নিশিকান্ত, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, লালচাঁদ বড়াল, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ইন্দুবালা, আঙ্গুর বালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ, হিমাংশু দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, অনল চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁদের কাছে বাংলা গান শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে পারে। শিল্পীরাও এক একজন দিক্‌পাল। বাংলা আধুনিক গানের বিখ্যাত শিল্পীরা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, উৎপলা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সবিতা চৌধুরী, গীতা দত্ত, হৈমন্তী শুক্লা, আরতি মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার যেসব গান গেয়েছেন তা আজও শ্রোতার মন কেড়ে নিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ফেলে আসা দিনের বহু বাংলা গান শ্রোতাকে নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত করছে যা আজকের অর্থাৎ সাম্প্রতিক বাংলা গানে খুব কম। বর্ষীয়ান শিল্পী শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় পুরাতনী রাগাশ্রিত বাংলা গানকে এক অসামান্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। টপ্পা গানের বিশেষত্বকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে গান পরিবেশন করেন তার কোন যথার্থ উত্তরসূরী তৈরি হ'ল না বলে মাঝে মাঝে নিরাশায় মন ভরে যায়। তাঁর গান জমিদার বাড়ির আসরে ক্ল্যাসিক্যাল গায়কী সমৃদ্ধ গান। দীর্ঘ অনুশীলনে বহু যত্নে এঁরা নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন। তাই কণ্ঠস্বরকে যেমন খুশি খেলিয়ে ব্যবহার করার অধিকারও অর্জন করেছিলেন। এই সব শিল্পীরই যেমন কণ্ঠসম্পদ তেমনি সুর মাধুর্য— শ্রোতাকে মোহগ্রস্ত ও বিহ্বল করে রেখেছিল। তেমনটি সাম্প্রতিক বাংলা গানে কোথায়?

এরপরের যুগে তৈরি হ'ল 'জীবনমুখী' গান। এই নামকরণে আলাদাভাবে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট হয়নি। জীবনকে, জীবনের বিচিত্র অনুভূতিকে বাদ দিয়ে কোন শিল্পই দাঁড়াতে পারে না। পূর্বের গায়কেরা জীবনকে অবলম্বন করে জীবনাতীতকে অনুভব করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই সেসব গান বিশেষ একধরনের প্রাপ্তি ঘটিয়েছে, রূপের মধ্য দিয়ে সেখানে অরূপের সাধনা। এখনকার শিল্পীরা সম্ভবত জীবনের অজস্র

জটিলতা ও সমস্যাকে একান্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তুলে নিয়ে আসছেন, অবশ্যই তাকে বাস্তবাতীত কোন মোড়কে মুড়ে নয়। তাই সাম্প্রতিক জীবনমুখী গান আমাদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে, কোন সূক্ষ্মতার সন্ধান দেয় না। প্রতিনিয়ত যে জটিল জীবনবৃত্তের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা তাকেই একান্ত সত্যতায় তুলে ধরা হচ্ছে বর্তমানের গানে। তবু কিছু প্রত্যাশা জাগানোর মত শিল্পীর কথা মনে পড়ে বৈকি। অসম্ভব বলিষ্ঠ সুরেলা গলা নিয়ে যিনি এই গান শুরু করেছিলেন সেই শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালী শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন। একে একে এলেন অঞ্জন দত্ত, শিলাজিত, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, পল্লব কীর্তনিয়া, স্বপন বসু, লোপামুদ্রা প্রভৃতি গায়কগণ। তবে এই ধারাটি খুব অল্পদিনেই নিজের অভিনবত্ব হারিয়ে গতানুগতিকতায় যেন পর্যবসিত হয়েছে। তবু বাংলা গানের এও এক বিশিষ্ট ধারা।

সম্প্রতি 'রিমেক'-এর যুগ। এই রীতিতে মূল গায়ককে বিস্মৃত হওয়া যায় না বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক আবেদন জাগে না। জনৈক 'রিমেক' শিল্পী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তিনি 'রিমেক'-এর মাধ্যমে মূল শিল্পীকে অনুকরণ করতে চান না, তাঁর গানটিকেই নিজের মত করে গাইতে চান। এই স্বাধীনতা সব শিল্পীরই আছে। কিন্তু অসামান্য কণ্ঠ সম্পদ নিয়ে যদি তিনি নতুন গান গাইবার সংকল্প করেন তবে তাঁর খ্যাতি জনপ্রিয়তা ভবিষ্যতের শ্রোতার কাছেও অম্লান থেকে যায়—আমরা শ্রোতা হিসাবে তাই-ই চাই। তা নাহলে বাংলাগান তার বিস্তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অবশ্যই।

গান যখন জীবনসংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠে, জীবনের অজস্র চাহিদা তাকে মেটাতে হয়, গান যখন বাণিজ্য হয়ে যায় তখন প্রতিভাহীনে বাজার ছেয়ে যায়। কণ্ঠের অনুশীলন নেই, সুরে দখল নেই, আত্মমগ্নতা নেই। গান এখন শুধু শোনার নয়, দেখারও। অর্থাৎ গান এখন বাহ্যেন্দ্রিয় প্রীতির বিষয়। ঝক্‌মকে পোষাক, কর্ণবিদারী যন্ত্রানুষঙ্গ, ষ্টেজ জুড়ে গায়ক-গায়িকার দাপাদাপি গানের মাধুর্যকে হারিয়ে ফেলছে দিন দিন। প্রতিভার অভাব এর বড় কারণ বলে মনে হয়। এই মুহূর্তের বাংলা গান সুরের তেমন অনুরণন রেখে যায় না শ্রোতার মনে। আজকের জীবনও যেমন বহির্মুখী, গানও অনেকাংশে তাই। অথচ এই মুহূর্তে অস্বীকারও করতে পারিনা যে, কিছু নতুন প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক গায়িকা গড়ে উঠছেন যারা ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগাতে পারেন। বাংলাগানের দরদী হিসাবে তাঁদের কাছে আবেদন—বাংলা গানকে বাঁচান, তাকে নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠিত করুন।

প্রাগাধুনিক বাংলা গানের দু'শো বছর

বাংলা গানের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। দশম শতাব্দীতে চর্যাপদের সময় থেকেই বাংলাভাষার আদিযুগের সূত্রপাত। এই সময়ের চর্যাপদ 'লোক জীবন-স্বভাব গীতিরূপে আভাসিত'। সেকারণে চর্যাপদকে চর্যাগীতি বা চর্যাগানও বলা হয়ে থাকে। চর্যাপদ প্রকৃত অর্থে গানই, রাগরাগিণী তাল সমন্বিত। পরবর্তী সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও গানের সুরেই রচিত। বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, পাঁচালি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—সবই সুরে রচিত বা গীত। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য শুরু থেকেই সুরাশ্রয়ী। গীতিপ্রবণতা বাঙালির নিজস্ব বিশিষ্টতা।

বৈষ্ণবপদ অবলম্বনে কীর্তন গান বাংলার বিশেষ জনপ্রিয় সংগীত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পরিশীলিত-অপরিশীলিত নির্বিশেষে বাংলার মানুষ কীর্তন গানের শ্রোতা। কীর্তন যতখানি বহিরিন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিতৃপ্ত করে অন্তরিন্দ্রিয়কে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছিলেন 'বহিরঙ্গ সনে নাম সংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন।' এই রস আস্বাদনই মুখ্য বলে কীর্তনের ভক্তিরসের দিকেই শ্রোতার মন নিবিষ্ট হয়, শ্রীরাধিকার সঙ্গে ঐকান্তিক অন্তরঙ্গতায় শ্রোতার নয়নবারি ঝরে। কীর্তন একক সংগীত নয় এবং একক গীত হলে তা তেমন জমাট বাঁধে না। অতএব কীর্তন সমবেত গান হিসাবেই সমধিক প্রচারিত। এই যৌথপ্রয়াসটি কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি। ১৫৮২ খ্রিঃ খেতুরিতে নরোত্তম দাসঠাকুর কীর্তনের মহোৎসব করেন, সেখানেই কীর্তনের নানা আঙ্গিকের প্রয়োগ বিষয়ে নতুন প্রয়াস শুরু হয়। যেমন কীর্তনে বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনার সময় র্নিধারণ, করতাল ও মৃদঙ্গের ব্যবহার, আখর বা আঁখরের প্রয়োগ (ভাবের স্পষ্টতার জন্য), নির্দিষ্ট কথাবিন্যাসের ও অতিরিক্ত কথার ব্যবহার (এটিও ভাবের স্পষ্টতার জন্য) এবং সর্বোপরি চৈতন্য পরবর্তী যুগে গৌরচন্দ্রিকার ব্যবহার।

কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকার পর আখর এবং পরে কাটান অংশ গাওয়া হয়। আখরের মধ্য দিয়ে একটি ভাবের নিস্তরঙ্গ অবস্থা থেকে উতরোল তরঙ্গাবস্থায় পৌঁছন হয়—ভাবটি ধীরে ধীরে স্পষ্টতা পায়। এর পরেই আবার শুরুতে ফিরে যান গায়ক—এর পাশাপাশি ব্যবহার হয় দোহারের। এই অংশে মূল গানটিকে ফিরে গাওয়া হয়। এই গানে খোলবাদনে সহায়তা যিনি বা যাঁরা করেন, কীর্তনে তাঁদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

কীর্তন গানেও বিচিত্র রাগরাগিণীর ব্যবহার এবং তালের বৈচিত্র্য থাকে। রাধাকৃষ্ণের দিবসরজনীর বিভিন্ন ভাবের কীর্তন বিভিন্ন সময়ের রাগরাগিণীতে গীত হয়। তবে এমন নয় যে, কীর্তন মূলতই রাগরাগিণীনির্ভর। রাগরাগিণীর পাশাপাশি লৌকিক সুরেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। শাস্ত্রীয় সংগীত যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা কেউ কেউ কীর্তন গান এবং সেক্ষেত্রে রাগরাগিণীর ব্যবহারে জোর পড়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। তবে এও সত্য যে,

কীর্তন গানের একটি বিশিষ্ট সুর তৈরী হয়ে গেছে যার সঙ্গে অন্য কোন গীতের সুরের মিল নেই। কীর্তনে সুরের মাধুর্য অনস্বীকার্য, কিন্তু কথার গুরুত্ব যে বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেখানেই ভক্তির আধিক্য সেখানেই তা কথাশ্রিত—সাধারণত এমনই হয়ে থাকে।

কীর্তনে নানান ধরণের তাল ব্যবহৃত হয়, সংখ্যার দিক থেকে তা প্রায় শতাধিক। যেমন—রূপক, আড়তাল, ঝাঁপতাল, ঝুর্ঝুটি, তেওরা, লোফা, একতালা, তেওট, দশকোশি, নন্দন এবং এমন বহু। বিভিন্ন মাত্রার তালের বিভিন্ন ছন্দে যখন কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজে তখন স্বভাবতই তা শ্রুতিসুখকর হয়ে ওঠে।

ভাল কীর্তন গান শুনে রসাপ্লুত হওয়া যেমন সাধারণ ঘটনা তেমনি ধুতি-চাদর পরিহিত বাবরি চুল চন্দন আঁকা গায়কের চেহারাটিও শ্রোতার মনকে বহুলাংশেই অধিকার করে থাকে। রাধা-কৃষ্ণের লীলারসের আশ্রয় যে কোন উপাখ্যানকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে পালাগান। বিভিন্ন আসরে বিভিন্ন পালাগান গাওয়া হয়ে থাকে। পালাগানগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'নাট্যশক্তি' তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। গায়ক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও মুখভাবের ব্যবহার করে গানকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।

নানাধরনের কীর্তন শোনা যায় —খেতুরির কীর্তন, গরাণহাটির কীর্তন, মনোহরশাহী কীর্তন, মান্দারনী ও ঝাড়খণ্ডি কীর্তন প্রভৃতি। তবে আজকাল এই ভাবে স্বতন্ত্র রীতির বিশিষ্টতা মেনে সবসময় কীর্তন গান করা হয়না। এর কারণ শিক্ষার অভাব হতে পারে, নিষ্ঠাবান গায়কের অভাবও বিচিত্র নয়। ফলে কীর্তন বলতে বর্তমানে বিশেষ এক ধরনের সুরেরই গান বলে ধরে নেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে অপর যে গানের ধারা প্রচলিত ছিল তা শাক্ত সংগীত। এই গানে শক্তিদেবীর প্রতি ভক্তি ও সৃষ্টির আদিশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের ভাবটিই মুখ্য। শক্তিদেবীর আখ্যান দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে। একদা পৌরাণিক চণ্ডী লৌকিক চণ্ডীর সঙ্গে মিলে যান। বস্তুত লৌকিক চণ্ডীকে আশ্রয় করেই শাক্তপদ রচিত হয়, সেখানে মধুর রসের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধারণ পদকার ছাড়াও বহু রাজা মহারাজা, সাধক ও কবিগান রচয়িতা শাক্তসংগীত রচনা করেছিলেন।

শাক্তসংগীতগুলি প্রধানত সাধনগীতি হিসাবেই গণ্য হয়। তবে সাধন মার্গীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও মানবিক লীলারসের ব্যাপারটিও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বহু শাক্তগীতি রচয়িতা বিশুদ্ধ সাধনগীতি লিখলেও আগমনী-বিজয়া অংশে বিশুদ্ধ লীলাগীতিও রচনা করেছেন। আগমনী বিজয়া অংশ কোন পদকারেরই সাধনালব্ধ অনুভূতির কথা নয় বরং আপন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার রসে রসায়িত। সেকালের বাংলাদেশে যে গৌরীদান প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দিতে না পারলে পিতা-মাতাকে বিপর্যস্ত হতে হত। সেই প্রথার যে করুণ দিক সেটিই আগমনী-বিজয়ার বিষয়বস্তু। আট বছরের বিবাহিতা শিশুকন্যাটিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। কিন্তু

শ্বশুরবাড়ির কঠিন নিয়মে বৎসরান্তে কন্যা একবারই পিতৃগৃহে আসতে পারে এবং পিতৃগৃহে অবস্থানের মেয়াদ হয় মাত্র তিনদিন। চতুর্থ দিনেই জামাতা নিতে আসেন কন্যাকে. মায়ের এবং কন্যার প্রাণ পরস্পরকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় আর্ত হলেও কন্যাকে বিদায় নিতে হয়, মা-কে বিদায় দিতে হয়। দুর্গাপূজায় শক্তি দেবীর তিনদিনের জন্য আগমন এবং দশমীর দিন বিসর্জনের তাৎপর্য এখানেই নিহিত। এই রীতি ছিল সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে আর তাতে সামিল হত প্রতিটি পিতা-মাতা-কন্যা।

আগমনী-বিজয়া ছাড়া অন্য পদে মা ও ছেলের সহজ মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে শক্তিদেবীর মাতৃরূপের কল্পনাই প্রধান সেখানে ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা থাকলেও তা মাতৃরূপকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। আবার ঐশ্বর্যরূপের বর্ণনা যেখানে আছে সেখানেও তারই মধ্য দিয়ে জগজ্জননীর মধুর রূপটিও ফুটে উঠেছে। প্রকৃত সাধকের কাছে মা সর্বাবস্থায়ই মধুর, সন্তান যেন মহাশক্তিময়ী মায়ের কাছে কোলের শিশু। তাই যে কোন অবস্থাতে মায়ের বুকেই সে আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিন্ত হয়। ঠিক এই কারণে সাধক কবির কণ্ঠে শোনা যায়—

মা বলে কাঁদিলে ছেলে, জননীর কি প্রাণে সয়!
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়!

যদিও শক্তিদেবীর অবস্থান শ্মশানে-মশানে, কিন্তু তিনি যখন উমা তখন মেনকার বাৎসল্যে তিনি দেবী নন, সাধারণ শিশুটির মতই অবোধ, জেদী, স্তন্যপানে বিমুখ। এইখানে মেনকার যে বাৎসল্য তার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদার বাৎসল্যের মিল লক্ষ করা যায়। শাক্তসংগীতের কবিরা মায়ের প্রতি অভিমান করেন, হাসেন, কৌতুক করেনও মায়েরই সঙ্গে। শ্মশানবাসিনী উমাকে সাধক কবিরা আপনবক্ষে স্থান দেবার জন্য ব্যাকুল এবং তজ্জন্য নিজ হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করতেও তাঁরা পশ্চাৎপদ নন—

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি।।

সাধক কবির কাছে কৃষ্ণ যে সে-ই কালী। আরাধ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য তাঁরা করেননি—কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।

আবার শাক্ত পদকারই সমন্বয়ের বাণীও শুনিয়েছেন—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি,
মগে বলে ফরাতারা গড বলে ফিরিঙ্গি যারা,
আল্লা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দকাজী।

বিষয়াসক্ত মনকে আসক্তিমুক্ত করতে না পারলে আরাধ্যের সাক্ষাৎ ঘটে না। সংসারে থেকেই আসক্তি-মুক্তির প্রয়োজন, সংসার ত্যাগ করে নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনাচরণের বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে শাক্ত পদকর্তাগণ শাক্তগীতি রচনা করেন

বলেই পাঠকের আন্তরিক উপলব্ধির চেষ্টা স্বভাবতই প্রবল হয়। শাক্তগানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—উপাস্যতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব। প্রথমটিতে উপাস্য দেবীর নানা রূপের কথা আছে যাতে জগজ্জননী কখনও লীলাময়ী, কখনও করুণাময়ী কখনও ইচ্ছাময়ী, কখনও ব্রহ্মময়ী, আবার কখনও ভীমা প্রলয়ঙ্করী। দ্বিতীয়টিতে পদকর্তাগণ সাধনার অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন স্তর এবং উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে নানা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শাক্তগীতিগুলিতে বিশ্বসৃষ্টিকারিণী শক্তিদেবীকে রসস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপেই দেখেছেন কবিরা। বাংলার শক্তিসাধনা সম্পর্কে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—"শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে সাজাইয়া মাতৃভাবশক্তির পরম পরিতৃপ্তি বাঙালি যেমন লাভ করিয়াছে, তেমন তৃপ্তিলাভ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙালীর মত 'মা' বলিয়া ডাকিতে পৃথিবীর আর কোনও জাতি পারে নাই—বুঝিবা পারিবেও না।...তাই আগমনী-বিজয়া গান বাঙালীই রচনা করিতে পারিয়াছে, আর কোনও জাতি পারে নাই।...রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অন্যপ্রকার শক্তি বিষয়ক সঙ্গীতও ভাবের গৌরবে ও গঠনের সৌন্দর্য্যে এক অপূর্ব এবং অনুপম সামগ্রী।

বৈষ্ণব প্রেমগীতির ন্যায় শক্তি বিষয়ক সঙ্গীতেও বাংলার আকাশ, বাতাস মুখরিত হইয়াছে। সংখ্যায়ও শাক্তসঙ্গীত নিতান্ত নগণ্য নহে। ইহার কাব্য-সৌন্দর্য্যও উপেক্ষণীয় নহে,...।"

শক্তিগীতিগুলিকে ১৬টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে—বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা, করুণাময়ী মা, কালভয়হারিণী মা , লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাতৃপূজা, সাধন-শক্তি, নাম-মহিমা, চরণ-তীর্থ। এই সমস্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা গীতি রচনা করেছেন তাঁরা হলেন মহারাজা নন্দকুমার রায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজা শিবচন্দ্র রায়, মহারাজা রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা মহতাব্ চাঁদ, দেওয়ান রামদুলাল নন্দী, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়, আশুতোষ দেব, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা), রসিকচন্দ্র রায়, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বনোয়ারীলাল রায়, পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশরথি রায়, ভারতচন্দ্র রায়, হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফকির চাঁদ), অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রামবসু, মদন মাস্টার, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এন্টনী সাহেব, নবীনচন্দ্র সেন, রূপচাঁদ পক্ষী, শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, নীলমণি পাটনী (কবিয়াল), মৃধা হুসেন আলী, মধুসূদন দত্ত, হরুঠাকুর (কবিয়াল) এবং আরো অসংখ্য পদকর্তা। এঁরা অনেকেই মানের বিচারে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। তবে শাক্তপদকর্তাদের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তাঁরা হলেন রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

শাক্তসংগীতের বিখ্যাত পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন প্রথম বয়সে কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। ইনি ছিলেন বৈদ্যবংশজাত। প্রথমদিকে পারিবারিক অবস্থা ভাল

থাকলেও পরে তা বিনষ্ট হয়। আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রিঃ হালিশহরে রামপ্রসাদের জন্ম এবং মৃত্যু ১৭৮১ খ্রিঃ। রামপ্রসাদের পিতার দুই বিবাহ, ইনি দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। রামপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তিনি জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করতেন। শোনা যায় যে, একবার সেরেস্তায় কাজ করতে করতে খাতায় 'আমায় দেও মা তবিলদারী' গানটি রচনা করেন। জানতে পেরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হন, কিন্তু জমিদার রামপ্রসাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে জমিদারী কর্ম হতে মুক্তি দিয়ে সাধন-ভজন করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। রামপ্রসাদ যথার্থ সাধক ও আত্মভোলা মানুষ ছিলেন বলে অর্থের প্রতি কোন লালসা ছিল না, ফলে সমগ্রজীবনে দারিদ্র্যদশা থেকে তাঁর মুক্তি মেলে নি। তিনি একাধারে সাধক, কবি ও উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। রামপ্রসাদ রচিত শ্যামাসংগীতে একপ্রকার সরল সাদাসিধা অথচ অন্তরস্পর্শী সুরের ব্যবহার আছে যার মধ্য দিয়ে পদকারের ঐকান্তিক ভক্তি ও পরমারাধ্যের কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিশিষ্ট সুরকে 'প্রসাদীসুর' নামে চিহ্নিত করা হয়। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত রামপ্রসাদ সম্পর্কে বলেছেন-"তিনি একদিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন—অন্যদিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তিকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা পূর্ববর্তী কোন সাহিত্যেই আর দেখি নাই।" বস্তুতপক্ষে শাক্তসংগীতের সাধনতত্ত্বকে এই পদকার তাঁর গানের মধ্য দিয়ে যেভাবে অতি সহজ করে দিয়েছেন তার সত্যিই তুলনা মেলা ভার। পদকর্তা যখন গেয়ে ওঠেন—"আমি কি দুখেরে ডরাই/দুখে দুখে জন্ম গেল/আর কত দুখ দেও দেখি তাই।"— তখন ভক্তহৃদয় দুঃখ সইবার জন্য যেন মায়ের বা আরাধ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। মানুষের জীবনে দুঃখ, বেদনার অন্ত নেই এবং তারই আধিক্য মানুষকে প্রতি মুহূর্তে মর্মাহত করে রাখে। তাই এসব গান সহজেই মানুষের বা শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষকে সচেতন করে দেন পদকর্তা কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষায় যার তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন—

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গেনা।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা।।
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না?
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না।।

মায়ের ওপরে সন্তানের এতই জোর যে, আবদার করে অনেকসময় গালিসূচক শব্দও নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেন রামপ্রসাদ—

এসব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা।।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা-
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেলা।।

রামপ্রসাদের প্রসাদী সুরের সঙ্গে কিছু বাউলের আত্মভোলা ঢং মিশে আছে বলে

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মনে করেন। রামপ্রসাদের গানের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানো, কৃষিকাজ, পাশা খেলা, কলুর বলদ প্রভৃতি রূপকের ব্যবহার আছে, বাউলরাও এমন সব রূপক ব্যবহারে অভ্যস্ত। রামপ্রসাদই বলতে পেরেছেন "মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যামতনু, একই সকল বুঝিতে নারি।।" মানস পূজাকেই রামপ্রসাদ যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ সম্পর্কে বলেছেন, 'ইনি ক্রিয়াকান্তা কিছুই মান্য করিতেন না....নিরাকারবাদীরা ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার উপাসনা করেন, ইনি কালীনাম উচ্চারণ করতঃ তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন।"

শাক্তপদের অন্যতম বিখ্যাত পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বর্ধমানের অম্বিকা কালনায় আবির্ভূত হ'ন এবং বর্ধমানের কোটালহাট অঞ্চলে পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈরি করে সাধনা করেন। সাধক এবং সিদ্ধ হলেও কবিপ্রতিভার ঘাটতি কমলাকান্তের ছিল না। তাঁর রচনাতেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়। কমলাকান্তের শাক্তসংগীত শ্রুতিসুখকর, ভক্তিরস সমৃদ্ধ। ইনিও বর্ধমান মহারাজার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে এঁর বহু পদ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। কমলাকান্ত শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিলেন। কমলাকান্তের চরিত্র-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বর্ধমান মহারাজারা তাঁকে সভাকবি করেন, রাজপরিবারের কেউ কেউ কমলাকান্তকে গুরু বলেও মানতেন। তিনি সাধনাকার্যের পাশাপাশি সংস্কৃত বিদ্যাও শিক্ষা দিতেন আবার আপনমনে শ্যামাসংগীত রচনা করতেন। তান্ত্রিক সাধক ছিলেন বলেই 'সাধকরঞ্জন' নামে তন্ত্রসাধনার একটি বই তিনি লিখেছিলেন, তবে গ্রন্থটি বেশ সরস। শোনা যায়, স্বয়ং দেবী কালিকা বাগ্‌দিনী বেশে এসে তাঁকে মাছ বিক্রি করে গিয়েছিলেন। ডাকাতি করতে এসে কমলাকান্তের মধুর কণ্ঠে শ্যামাসংগীত শুনে দস্যুরা মুগ্ধচিত্তে আত্মসমর্পণ করেছিল বলেও শোনা যায়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে উমামায়ের সতীন গঙ্গা বলে গঙ্গাতীরে তিনি যান নি। রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত দুই কবির নামেই আনুমানিক তিনশত পদ পাওয়া যায়। কমলাকান্তেরও আগমনী-বিজয়া শ্রেষ্ঠ রচনা। বিশেষত বিজয়াসংগীতগুলির কারুণ্য মর্মস্পর্শী। কমলাকান্ত রামপ্রসাদের মত আত্মভোলা কবি ছিলেন না। তাঁর পদে প্রায়শই সচেতন শব্দ ব্যবহার লক্ষ করার মত। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী দুই কবির তুলনায় বলেছেন,"একজন ভাবতন্ময়, আত্মহারা—অন্যজন সচেতন শিল্পী। একজন সরল, অনাড়ম্বর—তাঁহাতে ছন্দনৈপুণ্য নাই, বাক্‌চাতুরী নাই—আছে আত্মহারা ভক্তের আত্মহারাভাব, অপরজন আত্মমগ্ন হইলেও আত্মহারা নহেন, তাঁহার বিচার আছে, সংযম-বোধ আছে—তাই ছন্দের মাধুরী, শ্রুতি-মধুর শব্দ-ঝংকারের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি...।" রামপ্রসাদের মতই কমলাকান্ত ভক্ত ও ঈশ্বর—এই দ্বৈতভাব অবলম্বন করেই আপন সাধনমার্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। কমলাকান্তের বিখ্যাত পদ—

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হোলো, কামাদি কুসুম সকলে।।

সাধকের কাছে কালীপদ-নীলকমল প্রাপ্তির পর সুখ-দুঃখবোধে কোন ভিন্নতা থাকে না। কমলাকান্ত শক্তিদেবীর প্রতি একমাত্র "সর্বনাশী" ছাড়া অন্য কোন অস্বস্তিকর শব্দ ব্যবহার করেন নি।

রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত উভয়েই কিছু কিছু রাগভিত্তিক গান রচনা করেছেন—ভৈরব, ভৈরবী, কাফি-সিন্ধু, কালেংড়া ইত্যাদি। কমলাকান্তের কয়েকটি শ্যামাসংগীতে যেন বৈঠকি আমেজ লক্ষ করা যায়। এমন অনুমান করা যেতে পারে যে, শ্যামাসংগীতের অন্যতম রচয়িতা নিধুবাবুর প্রভাব এক্ষেত্রে ঘটেছিল।

শাক্তসংগীত অনেক কবিওয়ালাও রচনা করেছিলেন আপন মেধা ও চিত্তস্ফূর্তির কারণে। সেসব গানেও রাগরাগিণীর ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়, কেননা আমরা জানি, কবিগায়করা শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে রীতিমতো ওয়াকিবহাল ছিলেন। শ্যামাসংগীতে যেমন লঘুসুরের গানও শোনা যায় তেমনি আবার বেশ ভারী ছন্দে ও সুরে, গলায় গিটকিরী প্রয়োগ করেও গান গাওয়া হয়।

বাংলাদেশে প্রধানত তিনটি ধর্মসাধনার ধারা পাশাপাশি চলেছিল—বৈষ্ণব সাধনা, শাক্ত সাধনা ও বাউল সাধনা। বাউলদের সঙ্গে শক্তিসাধকদের মিল এইখানেই যে, উভয় সম্প্রদায়ই দেহ-সাধনার মাধ্যমে প্রকৃত তত্ত্বকথাকে খুঁজে পেতে চান। উভয় সম্প্রদায়ের সাধকই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করেন।

'বাউল' শব্দটি এসেছে 'বাতুল' শব্দ থেকে। যারা ঈশ্বর প্রেমে, মনের মানুষের সন্ধানে পাগল হয়েছেন তাঁরাই বাউল। বাতুল 'বাউল' যেমন হতে পারে তেমনি 'আউর' 'বাউর' থেকে 'আউল-বাউল' শব্দও এসে থাকতে পারে। 'আউর' শব্দের অর্থ ঈশ্বরসেবক। আর 'বাউর' শব্দের অর্থ বায়ুরোগগ্রস্ত। যাই হোক, বাউল সম্প্রদায়কে পল্লীগীতি গায়কদের অন্যতম মনে করা হলেও দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। সাধারণত পল্লীগীতিতে জীবনের কিছু বাহ্য আচার-আচরণই মুখ্য হয়ে ওঠে, সেইসব বিষয় নিয়েই গান রচনাও হয়, ধর্মকথা বা তত্ত্বদর্শন সেখানে মুখ্য নয়। কিন্তু বাউলগানে জীবনের সাধারণ আচরণের অনেক কথার পরেও ঈশ্বরের বা মনের মানুষের কথাই প্রাধান্য পায়। সে কারণে সাধারণ পল্লীগীতির সঙ্গে বাউল, মুর্শীদা প্রভৃতি গানের কিছু পার্থক্য আছে, তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বাউল গানে মনের স্বতঃস্ফূর্ততা, ভাবগভীরতা, কাব্যময়তা, মরমীভাবনা ও সরসতা লক্ষণীয়। আর সেকারণেই রবীন্দ্রনাথ বাউলগানকে ভালবেসে নিজের গানেও সেই সুর আরোপ করেছেন। বাউলদের গানের ভাষায় ব্যঞ্জনাধর্মিতা ও সংকেতময়তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর সেকারণেই শ্রোতার কাছে বাউলগান রীতিমত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাউলগান শিক্ষার্থীদের গুরুকরণ অবশ্য কর্তব্য। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এই বাউল সম্প্রদায়কে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, উৎসাহী ব্যক্তিরা সেই গ্রন্থ দেখে নিতে পারেন। সেখানে বাউলের মূলকথা নিয়ে আলোচনাসূত্রে বলা আছে—"আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাঁহারা এই প্রণালীর সাধক তাঁহাদিগকে বাউল বলে।"

বৌদ্ধযুগের শেষ দিক থেকেই বাংলাদেশের মানুষ এই বৈরাগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এর ফলে সহজ অভ্যাসেই সাধারণ মানুষ তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা রাখত। বাউল গান তত্ত্বমূলক হলেও অবশ্যই পাঠ্যকবিতা নয়, গান হিসাবেই এর মূল্য। বাউলদের মধ্যে তিনটি ভাগ লক্ষ করা যায়—মুসলমান বাউল, বৈষ্ণব বাউল, নবদ্বীপী বাউল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় সমাজে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করলে তাঁরা তাঁদের তত্ত্বের দ্বারা বাউলদের প্রভাবিত করেন। সেকারণে বৈষ্ণব বাউল দল এই সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত। মুসলমান বাউলরা কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে চাইতেন না, তাঁরা অনেক পরিমাণে মুক্তমন ছিলেন, তাঁরাই মুসলমান বাউল। মনের মানুষের খোঁজে যে-ই বাতুল হয় সে-ই বাউল হতে পারে বলেই মুসলমানদের পক্ষেও বাউল হতে কোন বাধা নেই। এসব কারণে বাউল গানে বহু ইসলামী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। বাউলরা নানা পারিভাষিক শব্দ গানে ব্যবহার করেন। ভিক্ষাই এঁদের মুখ্য উপজীবিকা। বাউল গান নিছক গানের জন্য গান নয়, সাধনারই অঙ্গ। শাক্ত গানে যেমন দেখা যায় যে, দেহভাণ্ডে যা নেই তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও নেই, বাউল গানেও প্রায় তাই। মনের মানুষের সন্ধান বাউলরা দেহকে অনুসন্ধান করেই করেন। ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটলে জড় অস্তিত্ব থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব, এর জন্য বিভিন্ন স্তরে দেহসাধনার প্রয়োজন। হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি বাউলদের সাধনার বিভিন্ন পথ। বাউলের তত্ত্বকথা বাউল না হলে বোঝা কঠিন। তবে নানা সুন্দর সুন্দর শব্দবিন্যাসে, উপমা-রূপকে তত্ত্বকথাটিকে সাজিয়ে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহু শব্দ তত্ত্বকথা প্রচারার্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন—বাইসাইকেল, আইন-আদালত, রেলগাড়ি, গার্ড, টিকিট মাষ্টার , হ্যান্ডেল এবং এমন আরো বহু শব্দ।

বাউল প্রসঙ্গে লালন ফকিরের কথা এসেই পড়ে। লালন ফকিরের গান যেমন ভক্তিভাবে সমৃদ্ধ তেমনি অসাম্প্রদায়িক বলেও বিশেষ সমাদৃত। তাঁর জন্মসময় সঠিক বলা যায় না, তবে আনুমানিক ১৭৭৫ সাল হতেও পারে। হিন্দু কায়স্থ পরিবারে তাঁর জন্ম। বিবাহ করার পর তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে এক নিষ্ঠাবতী মুসলিম মহিলা ও তাঁর স্বামী তাঁকে কুড়িয়ে এনে শুশ্রূষা করেন। ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজের দ্বার তাঁর জন্য চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। তখনই তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম এক কন্যাকে বিবাহ করে সাধনভজন করতে থাকেন। তিনি প্রথামাফিক ইসলামধর্মী ছিলেন কিনা জানা যায় না কারণ সংস্কারহীন বাউল বলেই পরিচিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথাই তাঁর গানে শোনা যায়। আবার শ্রীচৈতন্যর সার্বিক প্রভাবে গৌরাঙ্গ বিষয়ক গানও তিনি রচনা করেন। তাঁর গানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা দেখা যায়। তত্ত্বভাবনা তিনি বিভিন্ন সংকেতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তাঁর গানের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ও মধুর।

লালন ফকির হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে পরে মুসলমান বাউল হয়েছিলেন, আবার পঞ্জু শাহ্ মুসলমান হয়েও বাউল হয়েছিলেন। ইনিও লালনের মতই অসাম্প্রদায়িক

ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণেও মুসলমানসুলভ ব্যাপার ছিল না বলে মুসলমানেরা তাঁকে পছন্দ করতেন না। তাঁর গানও কাব্যগুণে সমৃদ্ধ ছিল। এঁদের সকলেরই মূলকথা হল তন্ত্র-শাস্ত্র পুরাণ কোরাণ যতই জান না কেন, ঈশ্বরকে সেখানে পাওয়া যাবে না, তাঁকে পেতে হবে মনের শুদ্ধতায়, কারণ তাঁর "বোবায় কালায় নিত্যলীলা।" বাহ্যেন্দ্রিয় থেকে সব কিছু সরিয়ে নিয়ে যখন অন্তরিন্দ্রিয় 'মনে' প্রবেশ করা যায় এবং সেখানেই প্রকৃত আরাধ্যের অনুসন্ধান করা যায় তখনই তাঁকে পাওয়া সম্ভব।

বাউল গান পরিবেশনের সঙ্গে একতারা হাতে বাউলের নৃত্য একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। তবে বাউল গানে নৃত্যই মুখ্য নয়, আপন মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মমগ্ন চিত্ত থেকেই এক ধরনের ভঙ্গি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়ে। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন যে, বাউলদের মধ্যেও কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা থাকে।

বাউল গানের সুরের সঙ্গে নানা সুরের মিশ্রণ ঘটে গেছে—ভাটিয়ালী, আঞ্চলিক নানা সুর আবার কিছু রাগরাগিণীর ব্যবহারও আছে। সুরে জটিলতা নেই, তবে মন উদাস করা ভাব আছে। গানের শুরুতেই তারসপ্তকে সুর টেনে নিয়ে যাওয়া বাউল গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

জয়দেবের কেন্দুবিল্ব, বীরভূম, বর্ধমান বাউলদের মূল বাসস্থান এবং বাউলচর্চার মূল কেন্দ্র। আজও বীরভূমের শান্তিনিকেতনে অসংখ্য বাউলের বাস, কেন্দুবিল্ব ও শান্তিনিকেতনে জয়দেবের মেলা এবং পৌষমেলায় বাউল এক প্রধান আকর্ষণ। গেরুয়াবস্ত্র পরিহিত, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, অনেক সময় তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা, কপালে চন্দন, হাতে একতারা, পায়ে ঘুঙুর—বাউলের এই রূপটি সত্যই শ্রোতার চক্ষুরিন্দ্রিয়কেও পরিতৃপ্ত করে বৈকি।

এই সময়কালের মধ্যে বেশ কিছু ছড়া, পাঁচালি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল এবং প্রচারিতও হয়েছিল। তাছাড়া, বিয়ের গান, ব্রতের গান, ঘুমপাড়ানি গান, চিঁড়েকোটার গান, ধানভানার গান, তাঁত বোনার গান, কৃষি বিষয়ক গান প্রভৃতি নানাধরনের গান থেকে বোঝা যায় যে, জীবনাচরণের যে কোন পর্যায়ে বাঙালি গানকে মুখ্য অবলম্বন করেছে তার আনন্দ, সুখ, দুঃখ, শ্রান্তি অপনোদন যে-কোন কাজে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্ব থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত একশ বছর বাংলার রাজনৈতিক বাতাবরণ ছিল ক্ষুব্ধ। ইংরাজ আমল—দেশে দ্বৈতশাসন—শাসকবর্গের মধ্যে দক্ষ নবাবের অভাব—দেশে নানা অরাজকতা ও অশান্তি ক্রমবর্ধমান। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতার অবসান ঘটল, সিংহাসনে একে একে বসলেন অপদার্থ সব নবাবেরা, শাসনক্ষমতা রইল ইংরেজের হাতে। ১৭৭০ খ্রিঃ অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অধিকার কায়েম করল ইংরেজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। এই সময় থেকেই প্রচলিত জীবনে ধরল ভাঙন, পরিবর্তিত হল শিক্ষাদীক্ষা, জীবনপরিচালনার ধারা। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ধারা তখন শেষ হয়েই প্রায় এসেছে—থাকার মধ্যে যাত্রা, পাঁচালি, ব্রতগান,

মুসলমানী কিস্‌সা জাতীয় রচনা। জীবনে অভাব ঘটল সুস্থতার, তার প্রভাব পড়ল শিক্ষাদীক্ষায় ও প্রতিটি আচার আচরণে, মানসিকতায়। আর তখনই কোন সুস্থ উৎকৃষ্ট পরিবেশের অভাবে গড়ে উঠল কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা জাতীয় রচনা।

পূর্বোক্ত সময়ে ইংরেজের শাসনকেন্দ্র কলকাতায় ইংরেজের অধীনে নানাধরনের চাকুরী করে একদল বিত্তবান শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যারা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল নগণ্য। যে শিক্ষা মানুষের রুচি তৈরি করে, শৈশব থেকে যৌবনাবস্থায় নিয়ে গিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সেই শিক্ষার প্রয়োজন আর তাদের ছিল না। কারণ শিক্ষাকে তারা অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে চিন্তা করত। কাঁচা পয়সার যেখানে তাদের অভাব রইল না সেখানে শিক্ষার প্রয়োজনও হল না, অতএব চারিত্রিক এবং মানসিক রুচির ব্যাপারেও কেউ সচেতন হল না। বিকৃত রুচি, স্থূল চাহিদা—তারই উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ। ইংরেজের অধীনে চাকুরী করে সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তারা ক্লান্ত-শ্রান্তচিত্তে যে অবসর বিনোদন চাইত তা কোনক্রমেই গম্ভীর পরিমার্জিত হতে পারে না। বিনোদনের বিষয়গুলি এই অবস্থায় নিতান্ত লঘু, স্থূল, আদিরসাত্মক হতে বাধ্য। মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি এলাকায় এইসব নিম্নরুচির কিছু উঠতি নব্যবাবুর আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতচন্দ্রের রচনায় এর ইঙ্গিত আছে—"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।" খেঁড়ু অর্থাৎ খেউড় কবিগানেরই নিকৃষ্ট পর্যায়।

এই সময়ে কবিগানের প্রচলন হচ্ছিল। ঠিক তার পূর্বে আখড়াই গানের সূচনা হয়। আখড়াই শব্দটি এসেছে আখড়া থেকে যার অর্থ অনুশীলনের স্থান। সেকালের বড় বড় গায়কেরা বিশেষ একধরনের গানের অনুশীলনের জন্য নিয়মিত আখড়ায় যেতেন এবং গানের অভ্যাস করতেন। এমনি করে অনেকসময় ছ' মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত অনুশীলন করে তাঁরা আসরে গাইতে নামতেন। এমন আখড়াই গায়ক প্রচুর ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ বসাক তাঁর 'গীতাবলী' গ্রন্থে বলেছেন যে, কবির অনুকরণে আখড়াই গানের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু আখড়াই যেহেতু কবিগানের চেয়ে মার্জিত সেকারণে আখড়াই গানের পরই কবিগানের প্রচলন হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে ইংরেজ আমলের শুরুতেই এই জাতীয় গানগুলির প্রচলন হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই।

আখড়াই গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কম হত, সুরের পারিপাট্য বা আধিক্য তেমন থাকত না। কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলের আখড়াই গানে আবার সুর ও বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বা সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করা হত। শুরুতেই ভবানীবিষয়ক গান গাওয়া হত। গানের ভাষা হত সহজ স্বচ্ছন্দ। কবিগানের মত স্থূল ইতর শব্দ সাধারণত ব্যবহৃত হত না। কবিগানের মত আখড়াই গানেও প্রতিযোগিতা হত। বিভিন্ন স্থানে আখড়াই গানের দল ছিল। অনেক সময় চুঁচুড়া ও কলকাতার আখড়াই দলে প্রতিযোগিতা হত। চুঁচুড়ার দল গানের সময় বাইশ রকম যন্ত্র ব্যবহার করত যার মধ্যে অন্যতম ছিল হাঁড়ি-কলসী। দৌড়, সব দৌড়, দোলন, পিড়েবন্দি, মোড় প্রভৃতি বিচিত্র তালে আখড়াই

গাওয়া হত। বাজনদারদের মধ্যে ন্যাটা বলাই, রাজু আঢ্য, নব আঢ্য, রসিক চাঁদ গোস্বামী, রূপচাঁদ এবং সুরকারদের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ বসু, বেহালাবাদকদের মধ্যে পার্বতীচরণ বসু, রাধানাথ সরকার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিজীবনীতে বলেছিলেন যে, রসিকচাঁদ গোস্বামীর ঢোল ও রাধানাথ সরকারের বেহালা যিনি না শুনেছেন তাঁর জীবন বৃথা।

আখড়াই গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব। এই রাজার সভায় ছিলেন কুলুইচন্দ্র সেন যিনি নিধুবাবুর আত্মীয়। মূলত ইনিই আখড়াই গানের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। ডঃ সুশীল কুমার দে আখড়াই গানকে বৈঠকী গান বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে কবিগানকে বলা হত 'দাঁড়া কবি' এবং আখড়াই ছিল 'বসা কবি'। নিধুবাবুরও আখড়াই দল ছিল এবং তাঁর গানে অনেক বেশি শাস্ত্রীয় কসরৎ থাকত, সুরের বিস্তার থাকত অনেক বেশি। নিধুবাবুই প্রথম গানের মধ্যে স্থূল শব্দের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে ভাষাকে শালীন করে তোলেন। পাথুরিয়াঘাটা, গরাণহাটা, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, শ্যামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে আখড়াই দল গড়ে উঠেছিল। নিধুবাবুর আখড়াইদল সবসময় প্রতিযোগিতায় জয়ী হত তার কণ্ঠমাধুর্য, সংযম, শালীনতা ও শাস্ত্রীয় সুর প্রয়োগের দক্ষতায়। মোহনচাঁদ বসু ছিলেন নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য। তাঁরও গায়ন ভঙ্গিটি ছিল অনেকটা গুরুর মতই এবং কণ্ঠস্বরও ছিল সুমিষ্ট। আখড়াই গানে নিধুবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা, বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্মতা ও শালীনতা সংগীতকে এক ভিন্ন জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

আখড়াই গানের প্রতিযোগিতা সাধারণত দু'-তিনটি দলের মধ্যে হত। যাঁরা সবচেয়ে ভাল গাইতেন তাঁরাই জয়ী হতেন। প্রত্যেকটি দলকেই একটি করে ভবানীবিষয়ক গান, একটি খেউড় ও একটি প্রভাতী গান গাইতে হত। গানের মাঝে মাঝে সঙ্গতের বিচিত্র ব্যবহার ছিল। রাতের বিভিন্ন প্রহরে রাগরাগিণীর যেমন পরিবর্তন হত তেমনি বাদ্যযন্ত্রেরও পরিবর্তন হত। মহড়া, চিতেন, পারঙ্গ—এই তিন পর্যায়ে আখড়াই গাওয়া হত। মহড়ার শেষে একবার সাজ বাজত, তারপর চিতেন এবং তারপরে আবার সাজ, তারপর পারঙ্গ এবং তার পরে গানের পরিসমাপ্তি।

আখড়াই গানে হাঁড়ি, কলসী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত শুনে কিছুটা অস্বস্তিবোধ হতে পারে, তবে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রগুলি ছিল বেহালা, তানপুরা, ঢোল, করতাল, জলতরঙ্গ, মন্দিরা, বীণা, বাঁশি ইত্যাদি। স্বভাবতই বোঝা যায়, নিধুবাবু যে গানের ধারক ও বাহক, যে গানে বাদ্যযন্ত্রের এহেন সমাবেশ সে গান স্বভাবতই উন্নতমানের ছিল। তবে ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী' থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই ধরনের আখড়াই গানের সমঝ্‌দার শ্রোতার ক্রমশ অভাব ঘটেছিল, ক্রমে আখড়াই বন্ধই হয়ে যায় এবং কবিগানের সূচনা হয়।

এরই মাঝে মোহনচাঁদের কোন এক পিতৃব্য একধরনের নতুন গান তৈরির জন্য আপনমনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সেকথা মোহনচাঁদকে জানালে তিনি স্থির করেন যে,

বিচিত্র রাগরাগিণীর কঠিন এবং নিপুণ খেলা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ গান তিনি তৈরি করবেন। এই ভাবনা থেকেই হাফ-আখড়াই-এর উৎপত্তি। এ গান শ্রোতৃমহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ফলে বিরোধীপক্ষ যখন নিপুণ গান গাইতে যান তখন আর শ্রোতারা তা নেয় না। কবি ও আখড়াই গানের মাঝামাঝি স্তর হল হাফ-আখড়াই। নিধুবাবু এই জাতীয় গান পছন্দ করতেন না। কিন্তু মোহনচাঁদের কণ্ঠে এই গান শুনে খুশি হয়ে তাঁকে হাফ-আখড়াই গাওয়ার অনুমতি দেন। হাফ-আখড়াই নিঃসন্দেহে আখড়াই এর নিম্নস্তর।

অতঃপর কবিগানের যুগ। কবিগানে কখনও কখনও কবি ও গায়ক স্বতন্ত্র হতেন, কখনও বা একই ব্যক্তি উভয় দায়িত্বই পালন করতেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত অশিক্ষিত অমার্জিত স্থূলরুচির শ্রোতৃবৃন্দ এবং হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাবু সম্প্রদায়কে সস্তা আমোদে পরিতৃপ্ত করার জন্য কবিগান গাওয়া হত। এই গানের যেমন বারোয়ারী আসর হত, তেমনি আবার কোন অভিজাত ব্যক্তি বা জমিদারের বাড়িতেও বায়না করে কবিগানের আসর বসানো হত। যেভাবেই হোক-না-কেন, কবি গানের বিশিষ্টতা ছিল এই রকম— কবিগান গাওয়ার জন্য দুটি পক্ষ থাকত,--একপক্ষ গাইত 'চাপান', অপর পক্ষ 'উতোর'। গায়কেরা আসরে গাইতে আসার পূর্ব পর্যন্ত মূল বিষয়বস্তু জানতে পারতেন না। দুই পক্ষই আসরে উপস্থিত হওয়ার পর পৃষ্ঠপোষক যিনি তিনি বিষয়টি ঘোষণা করতেন। ঘোষিত বিষয় শোনার পর কোন্ পক্ষ প্রথম গান ধরবেন তা তাঁরা নিজেরাই স্থির করে নিতেন। সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ গায়ক থাকলে সম্মান দিয়ে তাঁকেই পূর্বে গাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত। এঁরা তাৎক্ষণিক গান রচনা করে গাইতেন এ বড় কম বিস্ময়ের কথা নয়। প্রথমে দেবদেবী বন্দনাগান এবং সেই সূত্রে পুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে নানাধরনের প্রশ্ন প্রতিপক্ষকে ছুঁড়ে দেওয়া হত। প্রশ্ন অনেকক্ষেত্রেই যথেষ্ট জটিল হত। অপরপক্ষও 'উতোর' গাইবার সময় আগেই দেবদেবী বন্দনাগান গেয়ে প্রশ্নোত্তরে যেতেন। উভয়পক্ষেরই বন্দনাগান গাওয়ার কারণ দেবদেবীদের করুণাভিক্ষা করা। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের এটি স্বাভাবিক একটি রীতিই ছিল। মূল বিষয় যে কোন ধরনের হত--বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা থেকে শুরু করে বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি নানা সামাজিক বিষয় এবং তাছাড়াও রাজনৈতিক বিষয়ও অনেক সময় প্রসঙ্গক্রমে থাকত। সন্ধ্যা থেকে আসর বসত, রাত যত বাড়ত কবিগায়কেরা ততই মেতে উঠতেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবদেবীদের কথা ভুলে নানা অশ্লীল, অশ্রাব্য, স্থূল শব্দ ব্যবহার করে গান শুরু করতেন, সঙ্গে বেজে চলত কাঁশি, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজও বাড়ত, কবিগানও শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে যেত, দুইপক্ষই পরস্পরকে গালিগালাজ ও নির্মম আক্রমণ করতেন, আদিরসাত্মক নানা অশ্লীল প্রশ্ন তুলে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরপক্ষকে ঘায়েল করতে চাইতেন। প্রতিযোগিতা যখন চরমসীমায় তখন সামনের পিতলের থালায় প্যালা পড়ত—টাকা-সিকি-আনি-দুআনি এবং ধনী ব্যক্তি বা পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে গলার হার, শাল-দোশালাও। অমার্জিত

শ্রোতাদের এই ধরনের গানে নেশা ধরে যেত এবং প্রসঙ্গ যত স্থূল অশ্লীল হত ততই তাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কবিগান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—"পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে, গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোনো অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিনী সকলের মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল।

কিন্তু ইংরাজের নতুনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।...তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

....তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃ স্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।....তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক ঠক শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নতুন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।....

সৌন্দর্যের সরলতা যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘন ঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সঙ্গীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। ....সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে....।

কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা...কলঙ্ক এবং ছলনা।...সেই শখের কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্‌কার জন্মে।

কবিওয়ালাদের গানে সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা ক্ষণিক উত্তেজনা উদ্রেকই প্রধান লক্ষ্য।"

অবশ্য রবীন্দ্রনাথও প্রবন্ধের শেষদিকে বলেছেন যে, এই সমস্ত বিশিষ্টতা কবিগানের সাধারণ সমালোচনা। এরই মধ্যে কিছু কিছু কবিগানও যে উৎকৃষ্ট মানের ছিল না বা প্রতিভাসম্পন্ন কবি গায়কেরাই যে ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। যা-হোক, কবিগান থেকেই স্থূলরুচি শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থে আরো নিকৃষ্টমানের খেউড়, তর্জা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

বিখ্যাত কবি গায়কদের মধ্যে ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরুঠাকুর,

নীলমণি পাটুনী, কেষ্টা মুচি, জগন্নাথ বেনে, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গী, বলরাম বৈষ্ণব, মতি পসারী প্রভৃতি বহু কবিগায়কের নাম করা যায়। এদের 'কবিওয়ালা' নামে পরিচায়িত করা হয়েছিল, ইংরাজীতে যাকে বলে 'Poetaster'। বাংলা শব্দটি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কবিওয়ালা শব্দটি ফেরিওয়ালা সবজিওয়ালা মাছওয়ালার সমগোত্রীয়। ফেরিওয়ালা মাছওয়ালা তাদের পণ্য বিক্রয় করে এবং তার বিনিময়ে অর্থ রোজগার করে। 'ওয়ালা' শব্দটি বিভিন্নস্থানে ঘুরে ঘুরে পণ্যবিক্রয়ের ইঙ্গিতসূচক। সমাজের মানুষের প্রয়োজনেই এই সমস্ত পণ্য বিক্রয় হলেও পণ্য বিক্রেতাদের কিন্তু তেমন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত না, কিছুটা অবজ্ঞার ভাব মেশানোই থাকত। কবিওয়ালাও অনুরূপভাবে বিভিন্ন আসরে ঘুরে ঘুরে গান বিক্রয় করতেন এবং তার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতেন। গানের মত সূক্ষ্মকলার সঙ্গে ঐ ব্যবসায়িক দিকটি সংযুক্ত হওয়াতে তা বিশেষ সম্মান পায় নি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে এই রীতির আরো ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। বহু প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী আসরে তাঁদের শিল্পদক্ষতা প্রমাণ করেন দর্শক বা শ্রোতার কাছে—অর্থের বিনিময়েই। পার্থক্য এই যে, অধুনা শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম স্তরে পৌঁছবার যে কারিগরী প্রদর্শন ক'রে অর্থ উপার্জন করেন, কবিগায়কেরা তা করতেন না। তাঁদের রচনার অধিকাংশ স্থলেই তেমন শিল্পগুণ ছিল না। সে কারণে কবি গায়কদের গানকে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়েছে। তবে সব কবিওয়ালা যে নিছক অর্থ রোজগারের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন, তা নয়। এঁদের গুরুকরণ ছিল আবশ্যিক। হাতে নাড়া বেঁধে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হত কবিগান রচনা ও গাওয়ার জন্য। এছাড়াও চলত শাস্ত্রপাঠ—বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। এমনকি, কবিগানে রাগরাগিণী ও তালের ব্যবহার থেকে মনে হয় কবিওয়ালাদের সংগীতশাস্ত্রেও রীতিমত শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। সকলেরই যে কবিগান রচনার সমান শক্তি অর্থাৎ প্রতিভা থাকত, তা অবশ্যই নয়। কিন্তু যাঁরা প্রতিভার অধিকারী হতেন তাঁরা সেটিকে কেবলমাত্র কবিগান রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে খুশি থাকতেন না, কারণ কবিগানে সূক্ষ্মতার অভাব ছিল। সে কারণে অনেক উৎকৃষ্ট কবিগায়কেরা আগমনী-বিজয়া গান রচনা করতেন যা তৎকালীন বাংলার সমাজের একটি রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। সেকালের সমাজে গৌরীদান প্রথা ছিল যাতে আটবছরের কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য জরুরী ছিল। যে পরিবারেই কন্যা সন্তান থাকত সেখানেই এই রীতি এক সমস্যার সৃষ্টি করত। পূর্বে শাক্তগীতি আলোচনাকালে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কবিগায়কদের পিতৃহৃদয় এই করুণ ঘটনাটির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বলে গানে আন্তরিকতার অতিরিক্ত স্পর্শ থাকতই। এক্ষেত্রে অনেক কবিওয়ালারই গান রচনায় দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে।

মেয়েরাও 'মেয়েকবি' হিসাবে কবিগান রচনার ক্ষেত্রে আসতেন। সেখানে পুরো দলটিই মেয়েদের দ্বারাই তৈরি হত। অবশ্য বাজনদারদের মধ্যে পুরুষ থাকত।

এই সময়কালে যাত্রা, পাঁচালি, তর্জারও প্রচলন হয় এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন

করে। কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, শিবযাত্রা, চৈতন্যমঙ্গল যাত্রা প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল। দাশরথি রায় বা দাশু রায়ের পাঁচালিও যথেষ্ট জনপ্রিয় গান ছিল। পাঁচালি শব্দটি পদচারণা, পাঞ্চালিকা প্রভৃতি শব্দ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। দাশু রায়ের পাঁচালিতে যথেষ্ট আধুনিকতা ছিল সুর ব্যবহারে এবং বিষয়বস্তুতেও। নিছক পৌরাণিক বিষয় নয়, আধুনিক সমাজের নানা প্রসঙ্গ দাশু রায়ের পাঁচালিতে থাকত। অনেকক্ষেত্রে গান গাওয়ার সময় রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করা হত। প্রেম পাঁচালির প্রধানতম উপজীব্য। দাশু রায়ের পাঁচালিতেও আদিরসের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, অবক্ষয়ী সমাজের ভক্তিরস তখন বহুল পরিমাণেই অন্তর্হিত। শব্দের খেলা পাঁচালির আর এক বৈশিষ্ট্য। কথা এবং গানকে একত্র মিলিয়েই পাঁচালির উৎপত্তি। সুকুমার সেনের মতে সেকালের আখ্যায়িকা-নির্ভর গীতিরচনামাত্রই পাঁচালির অন্তর্ভুক্ত, যেমন—কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি'; আবার বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যা 'নাটগীতি পঞ্চালিকা' নামে পরিচিত।

দাশরথি রায়ও কবির দলে যুক্ত ছিলেন। কবিগানের অশালীনতা তাঁর পছন্দ হয়নি বলে সেখান থেকে সরে এসে পাঁচালি রচনা করেছিলেন। তবে তিনিও আদিরসকে বর্জন করতে পারেননি সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী তাঁর 'দাশরথি ও তাহার পাঁচালি' গ্রন্থে বলেছেন যে, পাঁচালি আখ্যায়িকা ও সংগীতের নিবিড় যোগেই সৃষ্ট। একে 'গীতপ্রধান আখ্যায়িকা' বা 'আখ্যায়িকা প্রধান গীত ' যে কোন নামেই চিহ্নিত করা চলে।

পাঁচালিগানও আসরেই গাওয়া হত চামরমন্দিরা সহযোগে, সঙ্গে থাকতেন দোহারের দল। পাঁচালিতেও পালা গান হত তবে তার বিষয় হত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক মানুষের কথা। পাঁচালিতেও শব্দের খেলা ছিল বলাই হয়েছে, তার সঙ্গে যথেষ্ট উপমা-অলঙ্কারেরও প্রয়োগ ছিল।

দাশু রায়ের পাঁচালির সঠিক সংখ্যা জানা যায় না, তবে প্রথম পাঁচালিটি 'শ্রীশ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহান্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন'। পাঁচালির গায়ক একজনই হতেন, তিনিই বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর কাহিনী গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতেন। ব্রজমোহন রায় অপর একজন পাঁচালিকার। তাঁর গানে দুশ্চরিত্র উঠতি বাবুদের কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব কারণেই পাঁচালিগান একেবারেই পছন্দ করতেন না।

তর্জা গান কবিগানের চেয়েও নিম্নরুচির। তবে তর্জায় কবিগানের মত 'উতোর'-এর রীতি ছিল। তর্জায় নাচ ও গান একই সঙ্গে চলত।

আখড়াই গানের আলোচনার সময় রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর প্রসঙ্গ উঠেছিল। নিধুবাবু বৈঠকি গান পছন্দ করতেন, নিজে মার্গসংগীত রীতিমত অনুশীলন করেছিলেন। অবশ্য বংশগতভাবে এঁদের পেশা ছিল চিকিৎসাবৃত্তি। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বর্গীর হাঙ্গামার সময় এঁরা কলকাতা ছেড়ে ত্রিবেণীতে চলে আসেন, সেখানেই মাতুলালয়ে ১৭৪১ খ্রিঃ রামনিধির জন্ম হয়। শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে ছোট থেকেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু গানের দিকে ছিল অসম্ভব ঝোঁক। তিনি তিনবার বিবাহ করেন, তাঁর

চারপুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবৎকালেই প্রথমা স্ত্রী, প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ কন্যা মারা যায়। তিনি ১৮২৫ খ্রিঃ ৮৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নিধুবাবু বৈষয়িক ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন ছিলেন। চেষ্টা করলে তিনি দেওয়ান হতে পারতেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। ছাপরার এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ নিয়েছিলেন। তবে কিছুকাল তালিম নেবার পর তিনি নিজেই হিন্দী গীতের বাংলা অনুবাদ করে রাগরাগিণী সংযুক্ত করে গান রচনা করতে থাকেন। তাঁর চাকরি চলে যাওয়ার যে ঘটনাটি ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে সে বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত আলোকপাত করেছেন যে, তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারী জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের কথায় চাকরীতে ঘুষ নেবেন না বলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। যা হোক, এসব বিষয়ে নানা মতভেদ আছে।

প্রথম জীবনেই নিধুবাবু বারবার স্বজনবিয়োগের বেদনা অনুভব করে মানসিকভাবে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থায় আপন মনোভাব প্রকাশ করতে গানই রচনা করেছিলেন—"মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন...।" মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন, বন্ধুবৎসল, দয়ালু, পরোপকারী আবার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চিত্ত ও নিয়মনিষ্ঠ। ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য থেকেই জানা যায় যে, নিধুবাবুর কাছে রাজা-মহারাজারাও গান শুনতে আসতেন, তিনি কোনোদিন কারো কাছে গিয়ে গান শোনাতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণেই তাঁকে 'নিধুবাবু' বলে ডাকা হত। অষ্টাদশ শতকে বহু বিখ্যাত ওস্তাদেরা বাংলার বাইরে থেকে বাংলায় গান গাইতে আসতেন। তখন অনেক বাঙালিই তাঁদের কাছে নিষ্ঠাভরে তালিমও নিতেন। নিধুবাবু বাংলার বাইরে থেকেই টপ্পা গান শিখে এসেছিলেন।

নিধুবাবুর টপ্পা বাঙালি সমাজকে মুগ্ধ করার অন্যতম কারণ বলে মনে হয় তাঁর গানে মানবিক প্রেম—যা সমাজের মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁর টপ্পাগানে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রাগরাগিণী এবং তার সঙ্গে শব্দের মিল রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। একথা ঠিক যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের ও তাল লয়ের নিখুঁত জ্ঞান না থাকলে নিধুবাবুর গান গাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'প্রীতিগীতি' গ্রন্থে বলেছেন, "নিধুবাবুর রচিত টপ্পার ন্যায় সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বাংলা ভাষায় আর....রচিত হয় নাই। উহাতে সুর লয়ের যেমন পারিপাট্য, তেমনি ভাষার লালিত্য...নিধুবাবুর দুইছত্রের গানে যে ভাব থাকে, অন্য কবির বড় বড় গানেও তা থাকে না....।" খ্যাতির শিখরে পৌঁছনর দরুণ তাঁর রচিত নয় এমন বহু গানও তাঁর নামে চলে গেছে। নিধুবাবুর গানে মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়। ডঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন..."His songs are neither indecent nor offensive, nor immoral" অথচ নিধুবাবু সম্পর্কে এমনও প্রচলিত ছিল যে, তিনি নানাবিধ অশ্লীল সংগীত রচনা করে দেশের মহা অনিষ্ট করেছেন। নিধুবাবুর 'নলিনী-ভ্রমরোক্তি' গানে স্থূলতার চিহ্ন নেই, কিন্তু একই বিষয় নিয়ে রচিত দাশু রায়ের পাঁচালিতে সেই ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নিধুবাবুর গানে পরকীয়া প্রেমের প্রসঙ্গ কমই আছে।

জানা যায়, টপ্পা নাকি প্রথমে শ্রীকণ্ঠে গাইবার জন্য রচিত হয়েছিল। টপ্পা এসেছিল

আফগানিস্থান থেকে। টপ্পামাত্রেরই বিষয় প্রেম, তাল লঘু, রাগরাগিণীর কড়াকড়ি খুব নেই, গিটকিরীর ব্যবহার খুব বেশি। টপ্পা স্থায়ী এবং অন্তরা দুই ভাগে বিভক্ত। এটি কবি-পাঁচালি-যাত্রার মত নয়, প্রধানত বৈঠকি গান হিসেবেই এর পরিচিতি এবং অবশ্যই উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্যই। খেয়াল ও টপ্পার গায়নভঙ্গিতে 'বহুত অন্তর'। টপ্পার জন্য কিছু নির্দিষ্ট রাগরাগিণীর ব্যবহার করা হয়। যেমন—খাম্বাজ, পিলু, সিন্ধু, কাফী, ঝিঁঝিট ইত্যাদি, তবে তালের দিক থেকে অনেক মিল লক্ষ করা যায়। খেয়াল ও টপ্পার মিশ্রণে টপ্ খেয়াল এবং কাওয়ালী, আদ্দা, কাহারবা ইত্যাদি তালে কিছু গান রচিত হয়েছে যাকে ঠুংরী বলা হয়। পোস্তা তালে গাওয়া উর্দুভাষায় রচিত গানকে গজল বলা হয়। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র যথার্থই বলেছিলেন যে, টপ্পায় সাধারণত দ্রুত তান বা গিটকিরির ব্যবহার বেশি। কিন্তু নিধুবাবুর গানে এক একটি সুরের উপর আন্দোলন বেশি বলে অপেক্ষাকৃত বেশি শ্রুতিসুখকর ও একই সঙ্গে করুণ-মধুর। পাশ্চাত্য প্রভাব জনজীবনকে গ্রাস করতে থাকলে ধীরে ধীরে বৈঠকী গানের প্রচলন হ্রাস পায়। তবে সম্প্রতি টপ্পার আদর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং টপ্পার গায়নবৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করে গান রচনা করেছিলেন।

নিধুবাবুর সমকালে যাঁরা টপ্পা রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীধর কথক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, আশুতোষ দেব, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক প্রভৃতির নাম জানা যায়। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ যিনি কালীমির্জা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচাঁদের সভাগায়ক ছিলেন, বৃত্তি পেতেন ১৫ টাকা। তিনশোর বেশি গান এঁর নামে প্রচলিত। অনুপ্রাসের ব্যবহার কালীমির্জার গানে খুব বেশি বলে কাব্যসৌন্দর্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সত্তর বছর বয়সে ইনি মারা যান।

রাধামোহন সেনদাস অনেক টপ্পা রচনা করলেও অনেকেই মনে করেন যে, তিনি ভারতচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। শাস্ত্রীয় সংগীতে অভিজ্ঞ হলেও তাঁর গানের মৌলিকত্ব নিয়ে সংশয় আছে।

বৈঠকি টপ্পার প্রবর্তক আশুতোষ দেব বা ছাতুবাবু বা সাতুবাবুর বাড়িতেই জলসার আসর বসত। মার্গসংগীতগায়কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ইনি ভাল সেতার বাজাতেন। তাঁর গানের ভাষা ছিল সহজ সরল।

কাশীপ্রসাদের গানে নিধুবাবুর প্রভাব খুব বেশি।

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক 'শব্দ কল্পতরঙ্গিনী' নামে অভিধান রচনা করেন, তাঁর স্ত্রীও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন এবং লেখালেখি করতেন। ইনি শ্যামাসংগীত, আগমনী ও রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রেমের গানেও নিধুবাবুর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শ্রীধর কথকের সংকলন পাওয়া যায়নি। তাঁর ভ্রাতৃষ্পুত্র অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য শ্রীধর কথকের 'স্বহস্তলিখিত' একটি গানের খাতা পেয়েছিলেন, তাতে মোট গানের সংখ্যা ১৭০। প্রেমের গানে ইনিও নিধুবাবুর মতই সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর, রসবোধসম্পন্ন।

নিধুবাবুর টপ্পাও কালক্রমে অন্তর্হিত হয়েছিল। তার কারণ হিসাবে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, ইংরাজের প্রভাবে ধীরে ধীরে দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্য সরে যাচ্ছিল, তারই ফলস্বরূপ টপ্পারও অন্তর্ধান। কেউ বলেন, ইংরাজ রাজত্বে মানুষের জীবনে সঙ্কট বেড়েছিল অনেক বেশি। সুতরাং নিছক প্রেমের গানে মানুষ আর সন্তুষ্ট রইল না, ফলে টপ্পার অবলুপ্তি বা ক্ষীয়মানতা। তখন শহরের ধনী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রায়ও আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র জানাচ্ছেন যে, উনিশ শতকের শেষদিকে কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 'টপ্পা দমন' আন্দোলন শুরু করেন। এতে সংগীত জগতের কি সম্পদকে হারানো হবে তা কেউ ভেবে দেখেন নি। এর পরিবর্তে তাঁরা 'নির্বিকার ধ্রুবপদ'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এরপর ব্রহ্মসংগীতের প্রতি জনচিত্ত ঝুঁকেছিল। অবশ্য ব্রহ্মসংগীতেও টপ্পার ধাঁচ কিছু কিছু ছিল। সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মসংগীতে টপ্পার ঢং দেখে তাকে 'অন্যায়' ও 'অসঙ্গত' বলে বিবেচনা করেছিলেন। এমনও বলেছিলেন, সংগীততত্ত্বে অজ্ঞতা ও রুচিহীনতা না থাকলে এমন গান কেউ রচনা করে না। সুতরাং টপ্পাকে এই সময় থেকে খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করা হয়েছিল।

ক্রমে বাংলা গানের আসরকে অধিকার করে নিলেন আধুনিক কবি, গায়ক, সুরকারবৃন্দ—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। এঁদের গান বাংলা গানের আর এক বিস্ময়কর সম্পদ যার আলোচনা স্বল্প কথায় হওয়া সম্ভব নয়। তবে বাংলা গান যে গীতিকবিতার অন্যতম সংস্করণ তার সূচনা আদিযুগ থেকেই হয়েছিল, আধুনিক কালে যা বিহারীলালের হাতে পড়ে নতুনত্ব পেয়েছিল। পুরনো গীতিকবিতায় সুর ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আধুনিক গীতিকবিতায় হল অনুপস্থিত। অর্থাৎ পূর্বে রাগরাগিণীর ব্যবহার বাহ্যতই ছিল, আধুনিক যুগে কবিতার অন্তরে গীতিময়তার অনুরণন ঘটল। কবিতার ক্ষেত্রে তার পরিচিতি ঘটল পাঠ্যরূপে এবং যে সকল গীতিকবিতা গান হিসাবে রচিত হল তাতে সুরের ব্যবহার হল সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের যার সঙ্গে পূর্ববর্তী সংগীতধারার কোনই মিল রইল না।

শাক্তসঙ্গীত ও তার আধুনিক চর্চা

অষ্টাদশ শতকের শাক্তসঙ্গীতের আধুনিক চর্চা যে কেবলমাত্র নজরুলেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল তা নয়। নজরুল ছাড়াও আরো অনেকেই সেকালে শক্তিদেবী বা শ্যামাকে অবলম্বন করে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁদের কথাও এ প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে, অষ্টাদশ শতকে শাক্তপদাবলীর রচনা বা শক্তি পূজার বিষয়টি সমাজে এত ব্যাপক হ'ল কেন? এটা জানতে গেলে যে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন তাতে আমরা দেখছি যে, বাংলাদেশে এই সময়কালে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় সকল ব্যাপারেই এক চূড়ান্ত বিপর্যয় বা অবক্ষয় জাতীয় জীবনকে দুর্বল করে ফেলছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের নানা বিপর্যয়, মুঘল আমলের শেষ পর্বে দুর্বল অক্ষম শাসকবৃন্দ, কৌশলী ইংরেজদের দ্বৈতশাসন, জমি-বন্দোবস্ত, ধীরে ধীরে সিংহাসনের স্থায়ী অধিকার দখল, দেশীয় মানুষের জীবনে নানা নিয়ম-কানুন, পর্তুগীজ প্রভৃতি দস্যুদের লুটতরাজ, রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারী নানা পীড়ন, অনাদায়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির নিলাম, সচ্ছল পরিবারদের আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়, প্রাদেশিক শাসনের সূত্রপাত—ইত্যাদির ফলে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত। এরই সঙ্গে ছিল অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, ধর্মের কলুষতা, নৈতিক আদর্শচ্যুতি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা।

এই দারুণ অবনমনমুখী সামাজিক পরিস্থিতি থেকে দেশবাসী মুক্তি কামনা করেছে। এরই মধ্যে জমিদার-দেওয়ান প্রভৃতি অর্থবান মানুষদের অর্থলোভ, বিত্ত প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা এবং বিত্তের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সে সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম, সহিষ্ণুতা ও অহিংস ভাবনা মানুষকে আর তেমন আকর্ষণ করতে পারছিল না। মানুষ চাইছিল অধিক পরাক্রমশালী কোন শক্তির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে। তন্ত্রসাধনা বা তান্ত্রিক আচার-পদ্ধতির বিকৃতিও সেই সময় লক্ষ করা যায়। অন্য দিকে অবস্থাপন্ন বিত্তবান ব্যক্তিদের ব্যভিচার ও দম্ভের প্রাবল্য সমাজকে সর্বনাশের প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছিল। জমিদারেরা অনেকেই নিজেদের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ডাকাতি করতেন। প্রভূত প্রতিপত্তি, প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে এঁরা সমাজে যথেচ্ছাচার করতেন। শোনা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর কালিপূজায় একরাত্রে ১০ হাজার পশুবলি হয়েছিল, তাঁরই পৌত্র ঈশানচন্দ্র তাঁর আমলে ২ হাজার ছাগ ও মোষ বলি দিয়েছিলেন, ৪০ হাজার মণ সন্দেশ ভোগ দিয়েছিলেন। এই শ্রেণীই বিত্তসম্পত্তি বৃদ্ধির কারণে এবং সংরক্ষণের কারণে শক্তিপূজার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁরা চেয়েছিলেন, ঐহিক উপাচারে দেবীকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপা-করুণা লাভ করতে। এঁদের পূজা করা কালীই "ডাকাতে কালী" নামে পরিচিত হল। পদরচয়িতাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও নিজেদের দুর্গতি থেকে মুক্তির কামনায় করালবদনী ভয়ংকরী, লোলরসনা দেবীর শরণাপন্ন হ'ল। এই দেবী যেমন ধ্বংসও করেন তেমনি আবার নব নব সম্ভাবনার সৃষ্টিও করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, সমাজে যারা পীড়িত অথচ পীড়ার কোন কারণ বুঝতে পারে না, তারাই স্বেচ্ছাচারিণী কিন্তু অশুভনাশিনী দেবীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ

করে। এরা ধরেই নেয় যে, এই সামাজিক বিনাশের কারণ ভয়ংকরী দেবীর ক্রোধ, সেই ক্রোধই তাদের দুঃখের কারণ। অতএব দেবীকে তারা স্তবগানের দ্বারা তুষ্ট করতে চায়। বাংলাদেশের ঐহিক জীবনের মঙ্গলদেবতাই শক্তি। শক্তিহীন জাতি পুনরায় তাঁর শরণাপন্ন হ'ল। ইনি শ্মশানচারিণী অথচ ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণা। জাতির জীবনে ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যখন বিধর্মীর পীড়ন প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন তারা মাতৃনাম উচ্চারণ করেছে, ভয় গেছে দূরে। যে শক্তিসাধনা একদা তন্ত্রাচারে, সাংকেতিকতায় ছিল সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য, সেই শক্তিসাধনাই সমস্ত অবরোধ ভেঙে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এল, সাধারণ মানুষ শক্তিদেবীকে 'মা' এবং আপনাকে তাঁর অধম 'সন্তান' ভেবে আপন মনের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা অভিমান-অভিযোগকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিল সহজ ভাষায়, সরল মনে—বিশ্বাস করে। শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছিলেন :

"রাজশক্তি যেখানে অব্যবস্থিত, রাজা যেখানে দুর্বল, রাজসভা যেখানে বিচার মূঢ়, সেখানে সর্বাশ্রয়াশ্রয় মাতৃচরণই একমাত্র ভরসা, মায়ের এজলাস অভিযোগ জানানোর স্থান।....জনজীবনে যে মর্মান্তিক আঘাত ও বেদনা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে জয় করিবার কৌশলও সাধকগণ মানুষকে শিখাইতে লাগিলেন। মাতৃচরণে শরণাগতি, মায়ের চরণে অন্তর-নির্ভরতাই দুঃখ জয় করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।"

দেখা যাচ্ছে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার জন্য, বিপদের ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য, দৈন্য থেকে সম্পদে স্থিত হওয়ার জন্য শক্তি উপাসকগণ এক দেবীর কল্পনা করলেন যিনি বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, এলোকেশী, নরমুণ্ডশোভিতা, কৃষ্ণবর্ণা কিন্তু ভক্তের চোখে স্নেহসিক্তা যাকে "ডাকিলে তাপিত প্রাণ জুড়ায়"। এই তাপিত প্রাণ কি শুধুই ভক্তের? আমরা হয়ত তাকে দেশকালের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ধরতে পারি। যে দেশে শান্তি অবসিত, দুরাচারেপূর্ণ মনুষ্যসমাজ, নৈতিকতা স্খলিত, সেখানে সমগ্র দেশই তাপিত—মা যদি পারেন সেই অগ্নিগর্ভ দেশকে শান্তির প্রলেপ দিতে—ভক্তের এই বাসনাকেও বোধহয় উপেক্ষা করা চলে না।

এই অবস্থা থেকেই শুরু হল তন্ত্রপ্রচার-বিযুক্ত শক্তিমহিমা গান। শাক্ত পদরচয়িতারা কেউ কেউ শাক্তসাধক হলেও সকলে অবশ্যই নন। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের নাম আমরা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্মরণে রাখব। সাধারণত শাক্ত পদকর্তারা অনেকেই বৈষয়িক মানুষ, নিরাপত্তাহীন ভূস্বামী, মানুষের প্রতি অনাস্থায় আক্রান্ত জমিদার, দেওয়ান, কবিযশঃ- প্রার্থীও কেউ কেউ, গীতিকবিরচয়িতা অনেকেই, নাট্যকার কিম্বা এমন আরো বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের মত শাক্তকবিরা সংসারত্যাগী নন, তাঁরা গৃহী, তাই শাক্ত পদগুলি সবই নিছক বৈরাগ্যের সঙ্গীত ছিল না। নশ্বর বৈষয়িক জীবনের অনিত্যতা অনেক সময়েই পদে ফুটে উঠেছে। অনেক সময় বিষয় বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ-অভিযোগ-অভিমান পদগুলিতে শোনা যায়। জীবনে ষড়রিপুর আক্রমণ এবং অনিশ্চয়তা, সাংসারিক নানা ক্ষয়-ক্ষতি জনিত আকস্মিক দুর্ভোগ—এসবের ফলেও অবশ্য একধরনের বৈরাগ্য এসেছে—

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌বো দুল্‌বো না গো।।

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুল্‌বো না গো।
ধনলোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বো না গো।।
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্‌বো না গো।
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো না গো।
রামপ্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বো না গো।। (সাধনশক্তি)

তবে শাক্তকবি বলেই দিয়েছেন, এই বৈরাগ্য আসার মূলে আছে মায়ের 'অভয়পদ' প্রাপ্তি।

অনেক শাক্ত কবি জীবনের সম্মানজনক পদের অধিকারী হয়েও দেশকালের অনিশ্চিত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য দেবীর শরণাপন্ন হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি নিশ্চিতভাবেই কাজ করেছে। মহারাজ নন্দকুমার রায়ের একটি পদ—

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি, কাল যায়।
সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে তায়।।
মতি চঞ্চল অতি দূরিত দূরাশয়
বিষয়-বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে,
তব কৃপা লেশ যদি হয়।।"

এঁরা চেয়েছিলেন জাঁকজমকে বহুবিধ উপচারে দেবীকে সন্তুষ্ট করে কৃপা লাভ করতে। "জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।" যে দেবী "জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা", "জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা" তাঁকে "কোন্ লাজে" পার্থিব তুচ্ছ ক্ষুদ্র আকর্ষণে এইসব কবিরা বাঁধতে চাইছিলেন? এই ধরনের কবিরা 'সংসার বিষে জ্বলে 'দুর্গা দুর্গা' বলে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছেন।

এইসব উপচারসর্বস্বতায় হাঁপিয়ে উঠলেন রামপ্রসাদ—"তুমি খুশি করতে চাও কি মাকে কেটে একটা ছাগলছানা।" রামপ্রসাদের লক্ষ্য হল 'জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে' 'শক্তিরূপা মুক্তার' অনুসন্ধান। তাই পার্থিব আকাঙ্ক্ষা দূরে সরিয়ে তিনি গাইলেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।

কোন দোটানায় না গিয়ে সেই অগাধ জলে ঝাঁপ দিলে "মিলবে রতন" একথা তিনি বুঝেছিলেন।

রামপ্রসাদ ছিলেন তন্ত্রসাধক, কমলাকান্তও। কিন্তু সেই তান্ত্রিক সাধনা ছিল মা-কে পাওয়ার সাধনা। মাতৃপদলাভ হয়ে গেলে আর সে কঠোর-কঠিন পথে তাঁরা চলেন নি। বিষয়-বাসনা থেকে প্রথম জীবনে রামপ্রসাদও যে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন, এমন নয়। তাই তাঁর প্রার্থনা ছিল "আমায় দে মা তবিলদারি। আমি নেমক্‌হারাম নই শঙ্করী।" সাংসারিক সামাজিক জীবনের এই বাসনা বেশিদিন থাকে নি। বিষয় বাসনামুক্ত হয়ে

শাস্ত্রীয় রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে উদার মানবতার জগতে এসে পড়েছিলেন তিনি। তখন আর দেবী শক্তিদেবী নন, সন্তানের 'মা'। তাই উপলব্ধি ঘটেছিল এই সাধক কবির—

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।

তীর্থমাহাত্ম্যকে স্বীকার না করে তিনি বললেন—

মন, যেতে চাও কেন কাশী?
ও মন, পাবি রে সকল ঘরেতে বসি'।

এই প্রাপ্তির জন্য সাধক কবিরা আপন দেহভাণ্ডকেই সাধনার চরমস্থল বলে স্বীকার করেছেন। সব তত্ত্ব জানার পর সাধক আপন দেহভাণ্ডের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রারে মিলিত করেন। তখন যে বোধ জাগ্রত হয়, তা এইরকম—

হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।।

তখন সাধক বলতে পারেন,

যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান কাজ কী হয়ে কাশীবাসী?
হৃৎকমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসে পাবে কালী দিবানিশি।

শুধু রামপ্রসাদ নন, শাক্ত সাধক কবি কমলাকান্তও বলেছেন—

মজিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে।।

শত শত তীর্থ ভ্রমণে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় তা কেবলমাত্র মাতৃপদ আরাধনাতেই লাভ করা যায়। শাস্ত্রীয় বন্ধন থেকে সরে এসে এই যে মানবিক উপলব্ধি—এই-ই তো আধুনিকতার লক্ষণ। অষ্টাদশ-উনিশ শতকের শাক্ত সাধক কবিরা আর সমষ্টিগত প্রকাশে গেলেন না, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভক্তি আরাধনার পথ উন্মোচিত হল। প্রচলিত শাস্ত্রীয় পূজা-আর্চা, পুরোহিতদলের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এই একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি সমাদর পেল। শক্তিপূজক বা আরাধনাকারীদের এ এক বিস্ময়কর উত্তরণ। এমনকি, 'মন'-কে সম্বোধন করে যেসব পদ তাঁরা রচনা করেছিলেন সেখানেও কপট ভণ্ড আরাধকদের নির্মম সমালোচনাও মানসিক শুদ্ধতারই নিঃসন্দেহ পরিচয়। সাধক-কবি কমলাকান্ত অবশ্য রামপ্রসাদের মত শাস্ত্রাচারকে সরিয়ে রেখে শুধুই মাতৃচরণাশ্রয়ী হতে চান নি। তিনি "আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশি-ভালী"-কে তাত্ত্বিকরূপেও দেখতে চেয়েছিলেন—"ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন-লয়।" তবে তিনিও সারকথা বুঝেছিলেন যে, এই আধিভৌতিক যত কামাদি-কুসুমের বিষয়-মধু', সবই 'কালীপদ নীলকমলে'র কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

এই শাক্ত কবিরা সাধনাবলে এমন এক মানসিক জগতে উত্তরিত হয়েছিলেন যেখান থেকে তাঁরা অভেদতত্ত্বে পৌঁছতে পেরেছিলেন—

মন, ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।।

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশি।
ওমা রামরূপে ধর ধনু কাশী রূপে করে অসি।

এই 'হরি-হর-তত্ত্ব' বুঝতে পারলেই আর কোন ভেদজ্ঞান কাজ করে না। তখন মানুষে-মানুষে ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে কোন বিরোধ থাকে না। এই ভেদজ্ঞান যে মনুষ্য-সৃষ্ট, সেই যুক্তিতে পৌঁছতে পারা সহজ নয়। শাক্তকবিরা তাঁদের ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্তিকেও মিলিয়ে নিয়ে সেই অসাম্প্রদায়িকতার বোধে, জীবই শিব, এই বোধে পৌঁছতে পেরেছিলেন। দেশের মধ্যে যখন নানা বিরোধ ও বৈষম্য, ভাবনা-চিন্তায় যখন কলুষতার স্পর্শ ঘটেছে, তখন শাক্ত কবিদের এতাদৃশ চিন্তন রীতিমত চমক সৃষ্টি করে। এই-ই তো সর্বকালের আধুনিকতা।

শাক্তকবিরা রচনা করেছিলেন 'নাম-মহিমা'। যে ভক্তের কাছে শক্তিদেবী যে রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। এই নাম উচ্চারণেই ঘটবে ভক্তের মোহ-মুক্তি, জীব-জগতের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ। সেখানেও ব্যক্তিই মুখ্য। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, "মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার দু অক্ষরে" ততই "শীতল হবে অন্তঃপুরে।" অজ্ঞাত কোন কবিও বললেন—

উপায় তাঁর নাম।
নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।

নামের নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি আছে, ভক্তের কাছে তাঁরই কদর। সে নাম তারা, শ্যামা, মা কিম্বা আর যা-ই হোক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে", তেমনি ভক্ত সন্তানেরা মাকে ডাকার জন্যই ডেকেছেন। যে কোন নামের অন্তরালে মা-ই উদ্দিষ্ট।

রামপ্রসাদ ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন যা ইতিপূর্বে ছিল না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর মা যশোদা ও ননীচোর কৃষ্ণের কথা মনে আসতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে অনেকেই পদ রচনা করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক বেশ কিছু কবির নাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত "শাক্ত পদাবলী"তেই পাওয়া যায়—

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল
আশুতোষ দেব
কালিদাস ভট্টাচার্য
চন্দ্রনাথ দাস
পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
অশ্বিনীকুমার দত্ত

রামকুমার নন্দী মজুমদার।
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি।

এঁরা ছাড়া, আছেন মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কবিগণ। আধুনিক এই সমস্ত কবিরা নতুন নতুন কাব্যসাহিত্যের ধারার সূচনা অনেকেই করলেও শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়া বা ভক্তের আকুতির মত পদও রচনা করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(ক) সুরট মল্লার—আড়াঠেকা
কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।
কী করো গিরিবর, যাও যাও এসো জেনে।
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়ে ভার,
সার করি যোগাচার,
শিব নাকি আছেন শ্মশানে।

(খ) বেহাগ—আড়াঠেকা
বলো গিরি, এদেহে কি প্রাণ রহে আর।
মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার।।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা।
বৃথা এই আঁখিতারা, সব অন্ধকার।।

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

(ক) ঝিঁঝিট—একতালা
ভজো মন, হরশংকর বিশ্বেশ্বর দিগম্বর ত্রিলোচন।
আসিয়া সংসার-মায়া-কারাগারে,
ফেরো দম্ভ ভরে কী কারণ।।
বেষ্টিত এ কারা মায়ার প্রাকারে,
পিশাচী পিশাচে রক্ষী রক্ষ দ্বারে,
হর কৃপা বিনা এড়াইবি না রে,
এ যে শমনে করে শাসন।।

(খ) পরজ—ঝাঁপতাল
আর সহে না এ জীবনে, বিষম যাতনা।
কতদিন অভাজনে করিবে মা করুণা।।
হয়ে বাসনার বশ, লাভ হল অপযশ,
সেবনে অনিত্য রস, নিত্য বাড়ে ভাবনা।।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

(ক) ঝিঁঝিট—যৎ

মিছে কাজে আর মজে মন তুমি থেকো না,
কালীনাম করো গান রবে না আর যাতনা।।
দিন দিন আয়ুহীন, হতেছে রে তনুক্ষীণ,
তব দিন সুখদিন চিরদিন রবে না।।

(খ) কাফি সিন্ধু—যৎ

এমন দিন কি আমার হবে,
আমার কালী বলে প্রাণ যাবে।।
দশেন্দ্রিয় সহ মনোবৃত্তি মায়ে লয় পাবে,
আমার চিদাকাশে চিন্ময়ী মা বিজলি সম খেলিবে
পঞ্চভূতময়দেহ জ্ঞানবাপীতে শোভিবে,
ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মহরি বলিবে বান্ধবে।।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

(ক) সিন্ধু—আড়াঠেকা

কিংকরে করো দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়ণি।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননি।।
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজনোবিহীন গতি,
গতিস্ত্বং হি গতিস্ত্বং হি, অগতির গতিদায়িণী।

(খ) ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

করো গো দক্ষিণে কালি আমার হৃদয়ে বাস।
চতুর্দোলে শম্ভুসহ পুরাও মন-অভিলাষ।।
তুমি তো মা জগদ্ধাত্রী ত্রাণ করো ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনি, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ

(ক) সুরটমল্লার—একতালা

কী দিয়ে করিব পূজা, কী বলো আছে আমার।
তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলই যে মা তোমার।
করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার।
নাই তো কোনো অধিকার।
(ওমা) সে সকল নিজস্ব ভাবা
কেবলই মনের বিকার।।

প্রমথনাথ সান্যাল

(ক) খাম্বাজ—কাওয়ালি

(মন) শয়নে স্বপনে বলো কালী।
মজোরে ভজোরে মন, রেখো না মনকালি।।
কালী কালী কালী বলে,
নাচো দুই বাহু তুলে,
এড়াবে শমন ভয়, যাবে ভব পারে চলি।।

বেণী দাস

(ক) ভৈরবী—যৎ

হৃদয়মন্দিরে দাঁড়াও,
শ্যামারূপে হে শ্যামনাশি।
ত্যজে বাঁশি ধরো অসি, লোল জিহ্বা অট্টহাসি।।
পীতধরা ত্যজ্য করে, বেড়ো কটি নরকরে,
দৈত্যের মুণ্ড করে ধরে, ঘুচাও ভক্তের মনমসি।

দুর্গাদাস লাহিড়ি

(ক) রামপ্রসাদি সুর

হৃদ্‌কমলে করো পূজা, সে রাঙা চরণ।
নরক যাতনা, আর তো রবে না,
পূজলে সে রূপ—ওরে ও মন।।
আঁখিজলে গঙ্গাজল করো রে সে পূজায়।
ভজন-পূজন সকল চেয়ে, তুষ্ট যে মা তায়।।

(খ) মল্লার—একতালা

মা মা বলে যতই ডাকি,
কই মা, বিপদ, কোথা যায়।
নূতন নূতন বিপদ সদাই,
প্রাণ-মন যে ভাঙে তায়।।
আশা-রজ্জু যেমনই ধরি,
ছিঁড়ে যায় মা একটানে।
ওপর থেকে অমনই পড়ি,
হাড়-গোড় ভাঙে পাষাণে'।।*

মধুসূদনের যে পদটি পাওয়া যায় তাকে নিঃসন্দেহে একটি গীতিকবিতা বলা যেতে

* পদগুলির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। উৎসাহী পাঠকগণ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'বাঙালির গান'—এপ্রিল ২০০১ সংস্করণটি থেকে উনিশ-বিশ শতকের এমন আরো বেশ কিছু শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতার পরিচয় ও গানের সন্ধান পেতে পারেন।

পারে। কবিতাটির বিষয়বস্তু 'বিজয়া'—শারদোৎসবের পর কন্যা উমার পতিগৃহে যাত্রা—

যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে।—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

যেহেতু এটি নিছক একটি পাঠ্য কবিতা তাই গানের মত এতে ভণিতা ব্যবহার করা হয় নি, ছন্দোগতও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। মধুসূদনের এই সনেটটির সঙ্গে প্রায় মিল দেখা গেল নবীনচন্দ্র সেনের 'বিজয়া'র পদটির—

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে।।

এইসব কবিতার মত প্রতিটি শাক্তগীতিই গীতিকবিতা হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে কেননা, এগুলি সবই মন্ময়ভাবনা সঞ্জাত। আগমনী বিজয়া গান সেকালে অতি জনপ্রিয় শাক্তগীতি ছিল। এই জাতীয় পদরচনার পশ্চাতে যে সামাজিক কারণটি ছিল তা সকলেরই জানা। গৌরীদান প্রথায় আট বছরের মেয়েটি মায়ের কোল ছেড়ে যাচ্ছে পতিগৃহে। কন্যাবিরহে শোকসন্তপ্তা মাতা অধীর হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত মায়ের কাছে আগমন ঘটে কন্যার—মাত্র তিনটি দিনের জন্য, চতুর্থ দিনেই বাজবে বিচ্ছেদের করুণ রাগিণী। যেহেতু সকল কবিই সামাজিক মানুষ সুতরাং তাঁদের সকলেরই কিম্বা অনেকেরই এই ঘটনার অভিজ্ঞতা জীবনে ছিল। শক্তিগীতি রচনায় এই বাস্তবের ছোঁয়া বহুপূর্বেই লেগেছিল। সেখানে যে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল তা সমস্ত কবিকেই আপ্লুত করেছিল। তাই আগমনী বিজয়া সম্পর্কিত পদরচনা স্বাভাবিক ভাবেই করা হয়েছিল।

মনোমোহন বসু আগমনী গান রচনা করেছেন। সেখানেও মেনকার মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন কবি। মেনকা বহু অনুনয় বিনয় করছেন গিরিরাজ হিমালয়কে তাঁর কন্যাটিকে একবার পিতৃগৃহে নিয়ে আসার জন্য। কোন কোন সময় মনে হয় যে, প্রকৃত শাক্ত সাধক কবিরা এই জাতীয় পদরচনায় যে দরদী মনের ছোঁয়া দিতে পেরেছেন, পরবর্তী কালের কবিদের, কোন কোন ক্ষেত্রে তার কিছুটা অভাব আছে— (১) প্রকৃতপক্ষে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ওই সামাজিক প্রথাটির কারুণ্যও হয়েছে অবলুপ্ত, (২) এই সময়কার কবিরা সকলেই প্রথামাফিক শিক্ষিত কবি, তাই বিষয়টি সম্পর্কে সহজ, সরল মনের অভিব্যক্তিতে যেন কিছুটা লেগেছে কৃত্রিমতার স্পর্শ। এঁরা গান লিখবেন ভেবেই লেখা—কোন সামাজিব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপে রচিত নয়। তাই কিছুটা Sophistication অবশ্যই চোখে পড়ে। মনোমোহন বসু জাতীয় নাট্যশালার সাম্বৎসরিক উৎসব সভার ভাষণে বলেছিলেন "আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া দাও।" সেদিক থেকে শাক্তগীতি—যার মধ্যে বাউল কীর্তন, ভজন, পাঁচালি—অনেক ধরনের

গানেরই টুকরো টুকরো মিশ্রণ থাকত তার চর্চা তিনি করেছিলেন। শাক্তগীতি অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিষ্ট সঙ্গীত। মনোমোহন বসুর আগমনী গান রচনার পশ্চাতে কি কারণ ছিল জানি না, তবে কোন এক সময় শীতলপ্রসাদ গুপ্ত নামে এক সরকারী চাকুরে এলাহাবাদ থেকে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সে সময়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রবংশের কাছে কন্যাদান একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর আগমনী গান রচনায় এই সব অনুষঙ্গ এসেছে কিনা তা বলা আজ দুরূহ। তবে তিনি শুধু গান নয়, 'সতী' নামে একটি নাটকও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে তিনি কিছু ভক্তিমূলক গান রচনা করেছিলেন। একটি হাফআখড়াই শ্যামা বিষয়ক গান লিখেছিলেন মনোমোহন। তবে সে গানে শ্যামা ও শ্যামের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানেন নি—

ও মা কালিকে, শ্যামকে রথে দেখে, প্রাণে মরে রাই বিষাদে।
আমরা শরণ্যে শ্রীপদে, রাখ মা বিপদে, মা গো! হ'য়ে বরদে।

এই গানকেও তিনি কবিগানের সাদৃশ্যে ৬টি ভাগে ভাগ করে লিখেছিলেন— মহড়া, তেহারান, চিতেন, ফুকা, ডবল ফুকা, মেল্‌তা। যদিও এ গানে কোন রাগরাগিণী বা তালের উল্লেখ নেই, তবে অন্য অনেক গানে তিনি যে সেগুলির ব্যবহার করতেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'আগমনী' নামে একটি গীতিনাট্য, 'বিজয়া' বা 'প্রতিমা বিসর্জন' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। শাক্তগীতির সংকলন গ্রন্থটিতে তাঁর 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের একটি গান পাওয়া যায়—

কোলে তুলে নে মা কালী
কালের কোলে দিস্ নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে।।

মাত্র চার বছর বয়সে অতুলকৃষ্ণ পিতৃহীন হয়েছিলেন। বোঝাই যায়, জীবনে অনেক সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছিল। পরবর্তী জীবনেও নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেও অনেক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সে সময় ওই জাতীয় গান রচনা অস্বাভাবিক নয়। লক্ষ করা যেতে পারে যে, অতুলকৃষ্ণের গানে অন্তরের আবেগ অজস্রধারায় ঝরে পড়েছে।

অমৃতলাল বসুর 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ে "অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি। /যা ছিল, সকলই গেছে, মিছে শুধু ঘুরে মরি।" গানটি পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'আগমনী', 'জগজ্জননীর রূপ' পর্যায়ের গানও পাওয়া যায়। তাঁর 'আগমনী' গান—

জনক ভবনে যাবে, ভাব কি তার?
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর।
আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাকো আর।.....ইত্যাদি

এ গানে কি মিশে আছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বেদনার্ত কোন অনুভব? 'জগজ্জননীর

রূপ' পর্যায়ের গানে শক্তিদেবীর ভয়ঙ্করী রূপের বর্ণনা আছে। ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদ রচিত কালীকীর্তন প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালীর কবি। সেকালের হারিয়ে যাওয়া পুরনো গান ও কবিতা তিনিই উদ্ধার করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর' পদ্যানুবাদ করেছিলেন। শাক্তগীতি হিসাবে রচনা করেছিলেন 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান। আগমনী গানে মায়ের সুগভীর স্নেহবাৎসল্য অঝোর ধারায় ধরে পড়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচনা করলেন 'আগমনী' গান—

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন, ...ইত্যাদি।

এছাড়া তাঁর 'মহাপূজা' গ্রন্থে দুর্গাপূজা বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। দুর্গা শক্তি সবই একই দেবীর ভিন্নরূপ ধরে নেওয়া যায়। সেখানে একটি প্রবন্ধ ছিল 'শক্তিসেবা'। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আগমনী গানটির মধ্যে মেনকা উমার কথোপকথন আছে। এমনকি বাবা (শিব) তাদের সঙ্গে মাতুলালয়ে কেন আসেন নি তা নিয়েও হিমালয়কে দেখে কার্তিক প্রশ্ন করেছে গৌরীকে। সমস্ত গানটি স্নেহ বাৎসল্যে পরিপূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ে লিখেছেন —

"চরণ ধ'রে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ না মা।
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বন্ধু দেবকুমার বসুকে লিখেছিলেন—

"মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। পুত্র কন্যা যদি না জন্মিত ত হয়ত একদিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতাম। ....

আমি যতই ভেবে দেখছি, বুঝতে পাচ্ছি যে, "এ জীবনটা কিছু না।"....এই অসার গদ্যময় চাকরি।....জীবন-পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারিদিক থেকে শুধুই ঔদাস্য আর অবসাদে যেন আমায় ঘিরে ফেলছে। 'অসার সংসার' আগে বিচারে ও অনুমানে বুঝতাম,—এখন প্রতি পদে 'হাড়ে হাড়েই' বুঝছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্ধ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ ক'রে মরি?"

স্ত্রী-বিয়োগে কাতর-হৃদয় পুত্র-কন্যাদের দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বে ক্লান্তির শিকার হয়েছিল, সন্দেহ নেই। তা থেকেই জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছিল। ভরসা করা বা আশ্রয় নেবার মত যখন কোন জায়গাই মানুষের থাকে না, তখন জগজ্জননী মায়ের কোলেই শ্রান্ত ছেলে বিশ্রাম খোঁজে,

"এতদিন তো কালী, ভীমা তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হোল, এখন মা তোর অসি নামা।"

জগৎ সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার মুহূর্তে মাতৃশরণ কোন নতুন কথা নয়। রামপ্রসাদ-

কমলাকান্তের পদেও এমন পরিচয় মেলে। 'মা' নামে যে শান্তি, সেই শান্তিই খুঁজেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর একাধিক নাটকে বেশ কিছু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ 'আগমনী' নামে নাটিকা প্রকাশিত হয় এবং সেই বছরেই অল্প কিছুদিন পর অভিনয়ও হয়। নাটিকাটিতে সাতখানি শ্যাম্যাসঙ্গীত রচিত হয়েছিল, যেহেতু নাটকের নামই 'আগমনী' সুতরাং সব গান কয়টিই আগমনী পর্যায়েরই গান,

(১) কুস্বপ্ন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী
(২) পাষাণ হৃদয় তব আমি হে পাষাণী
(৩) আমার উমা এল রে দেখ গো রাণী নয়ন ভ'রে।
(৪) তুমি ত মা ছিলে ভুলে,
(৫) যুগল মিলনে মন হ্রে, হের সব আঁখি ভ'রে
(৬) প্রবলা অচলা, বিশ্ববিমোহিনী, সৃজন-কারিণী
(৭) ওমা, কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উমা, বল্‌মা তাই।

প্রত্যেকটি গানেই রাগ এবং তালের উল্লেখ করা হযেছে—আলাহিয়া, জয়জয়ন্তী, সরফরদা বাহার, সাহানা, শ্রী এবং তাল আড়াঠেকা, একতালা, যৎ খেমটা, ঝাঁপতাল।

১৮৮৩ খ্রীঃ 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকেও শ্যামাসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছিল। সেখানে একটি গানে শক্তিদেবীর বিভিন্ন মূর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—কালীমূর্তি, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, মহালক্ষ্মী। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে নিয়মিত যেতেন, মাতৃমন্দিরে বসে মায়ের নাম জপ করতেন। এই 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক লেখা শেষ হবার পর একরাত্রে মায়ের নাটমন্দিরে তিনি ড্রেস রিহার্সাল করিয়েছিলেন। "জগজ্জননীর সম্মুখে অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রাণে পরম তৃপ্তি লাভ হইয়াছিল।"

'বিল্বমঙ্গল' নাটকেও (১৮৬৬ খ্রীঃ) পাগলিনীর কণ্ঠে একাধিক শ্যামাসঙ্গীত দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র—

(১) আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
(২) সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী
(৩) আমায় বড় দেয় দাগা

শক্তিগীতি অবলম্বনে লিখিত এই সব নাটকের গান সেযুগে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নাটকগুলি লেখার সময় যুক্তি অপেক্ষা ভক্তিকেই তিনি বড় বলে মেনেছিলেন।

নাটকের গানও রাগরাগিণী ও তাল সমন্বিত। এইসব গানের কোনটি যখন শাক্তপদাবলীতে সংকলিত হয়েছে তখন কিন্তু সেখানে কোন রাগরাগিণী বা তালের উল্লেখ করা হয় নি।

এ পর্যন্ত আধুনিক কালের কবিরা যাঁরা শক্তিদেবী সম্পর্কিত গান রচনা করেছেন তাঁদের দু'এক জন ছাড়া বাকিরা কেউই শক্তিসাধক নন। তাঁরা সকলেই গান রচনা করেছিলেন বাঙ্গালীর ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে। ধর্মানুরাগী মানুষ নতুন যুগের

যুক্তিবাদকে গ্রহণ করলেও ধর্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হতে পারেন নি।। এসব গান তারই নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথে পোঁছে আমরা দেখলাম যে, তিনি শুধুমাত্র পূর্বৈতিহ্য বলে শক্তিপূজাকে স্বীকার করে নিতে চান নি। তিনি বাল্মীকি প্রতিভায় যে শক্তিপূজা বা শ্যামা মায়ের কথা বলেছেন তিনি ডাকাতদলের দেবী। তাঁর যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা অতি ভয়ংকর—

ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ-মাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্ট-পট্ট-কেশ অট্ট অট্ট হাসেরে—
হাহা হাহাহা হাহাহা!

এরই সঙ্গে মনে পড়ে শাক্তপদাবলীতে সংকলিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদ—

হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপরূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ শরণ লয়।।
বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
... ...
কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা।
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।। (জগজ্জননীর রূপ)

কিম্বা রামপ্রসাদের পদটি—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে গজ গরাসে।।

অথবা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত পদটি—

অতি বিশাল বদন মণ্ডল
লক্ লক্ রুধির লোলুপ রসনা,
রুধির-ধার-স্রুত বিপুলদশনা
অস্থিচর্ম্মসার, কঙ্কাল হারল্ল
বিভূষিত দিক্‌বসনা ব্যোমগ্রাসিনী।
অতিক্ষীণ কটি বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কিণী,
মহাকাল-কামিনী, উৎকট আসব-পান-মগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা;
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী, নরমাংসাশী
ঈশান-মর্দ্দিনী টলটল মেদিনী!
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশানবাসিনী।

এই কালীকে রবীন্দ্রনাথ "ডাকাতে কালী" রূপেই দেখিয়েছেন। বালিকা ভীত সন্ত্রস্ত করুণ স্বরে মুণ্ডমালিনীকে করুণাময়ী রূপে দেখার বাসনা প্রকাশ করেছে। 'ত্রিনয়নী'-র

'রাঙা নয়ন' তার কাছে ভীতিরই সঞ্চার করেছে। বাল্মীকীর কণ্ঠে যে শ্যামাসঙ্গীতটি গীত হয়েছে তা এইরকম—

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা।
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা।
এতদিন কী ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়নজলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা।
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা।

রবীন্দ্রনাথ কালীর ভয়ংকরী রূপটিকেই তুলে ধরেছেন। শক্তিপূজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শোনা যেতে পারে : "শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উল্টো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।"

এই শক্তিপূজার শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দিকটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোন ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

যে-সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে-সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থান-পতন বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হত। তখন চারিদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্‌দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে-ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমত স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায় বিচার করে না তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।"

রবীন্দ্রনাথ শক্তিপূজার বলিদান প্রথাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। যে দেবীর পূজায় প্রাণের সংহার ঘটছে তাঁকে 'মা' বলে ডাকার যৌক্তিকতা কী থাকতে পারে?

তিনি বললেন—

"আমাদের দেশে সাধারণত শক্তিধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংস ভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার—এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই 'শক্তি' শব্দের সাধারণ যে অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলা দেশের মঙ্গলকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থেই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

.....দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরও একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তি পূজায় স্থান পায়। একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কিনা সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত সে অর্থকে অসংগত বলা যায় না; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে—অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন-সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে—সে সম্বন্ধে আমার যা বলবার অন্যত্র বলেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে।"

প্রসঙ্গত আমরা 'বিসর্জন' নাটকের কথা অবশ্যই মনে করি। সকলপ্রকার হত্যার বিরুদ্ধে এই নাটককে প্রতিবাদ হিসাবে আমরা বিবেচনা করতে পারি। এ পর্যন্ত একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শক্তিপূজার বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যক্তি কবি সাহিত্যিককে এহেন ব্যাখ্যা করতে শুনি নি। এ শুধুমাত্র একজন ব্রাহ্মধর্মের মানুষের অন্য ধর্মের সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা নয়, যুক্তির বিচারে যে কোন শিক্ষিত মানুষই একে সমর্থন জানাতে বাধ্য। পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির মানুষ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে কখনই অস্বীকার করতে পারেন না। তবে আগমনী পর্যায়ের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন অসহিষ্ণুতা ছিল না। বরং 'গল্পগুচ্ছের খাতা' গল্পে আগমনী শুনে উমার অভিমানাহত হৃদয়ের প্রসঙ্গ আছে। ফলে এই ধরনের গানের যে সামাজিক আবেদন, তা সকলের কাছেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। 'লিপিকা'-র 'আগমনী'-শীর্ষক রচনাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

আগমনী

"আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, "ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো?

... ...

সে বললে, "আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।

আমি যে কী বুঝলেম জানিনে, বলে উঠলেম, 'তবে আর দেরি নেই।

সে হেসে বললে, "না, এল বলে।

... ...

"আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চারদিক ঝল্‌মল্ করে উঠল।

... ...

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "কী করি! সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর সাজসরঞ্জাম সবতো এসে পৌঁছল না।'

... ...

উত্তর এল, "আজ আগমনী যে।

... ...

মন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে।

... ...

... ... শরৎপ্রভাতের শুকতারা

... ...

শিউলিবনের শিউলি ফুল।

... ...

লেজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

... ...

তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্যে।

হাঁ, এরই জন্যেই ত প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।

এরই জন্যে এত জায়গা চাই?

হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্য ঘরভরা সরঞ্জাম। আর এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।

... ...

ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে।"

সবশেষে আমরা এসে পৌঁছচ্ছি নজরুল ইসলামের রচিত শ্যামাসঙ্গীত এবং শক্তিদেবী সম্পর্কে তাঁর অনুভবে। নজরুলের গান সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন বা আজও কাজ করে চলেছেন তাঁদের মতে, নজরুলের মোট ভক্তিগীতির সংখ্যা ৫২৪, তন্মধ্যে ইসলামি গান ১৯০, বাকি ৩৩৪ টি গান শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য ভক্তিমূলক গান। জীবনীকারেরা অনেকেই বলেছেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বুলবুলের বসন্তরোগে অকালমৃত্যু কবিকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। বুলবুলের প্রতি ছিল কবির অস্বাভাবিক স্নেহের আকর্ষণ। তাঁর মৃত্যুতে নজরুল সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন। মনের যন্ত্রণা, পুত্রবিরহের অসহায়তায় নজরুল শ্যামাসঙ্গীত লিখতে শুরু

করেছিলেন। কেউ বা বলেন, নজরুল প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র অনুরোধে শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন। যাই হোক, পুত্রের বিরহে নজরুল নাকি বেদান্ত সাংখ্য চণ্ডী গীতা ইত্যাদিও পড়তে শুরু করেছিলেন মানসিক শান্তি লাভের আশায়। এমন কি, তিনি বিভিন্ন যৌগিক মুদ্রাও অনুশীলন করতেন। এর কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেন যে, মৃত পুত্রকে একবার সশরীরে চোখে দেখতে পাওয়ার বাসনায় তিনি গৃহী তান্ত্রিক সাধক বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যান, দীক্ষা নেন, গেরুয়া পরতে শুরু করেন। আহার করতেন নিরামিষ, দিনে একবার। এমন কি বাড়ির চিলেকোঠায় নাকি কালীমূর্তিও স্থাপন করেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা মন্ত্র জপ করতেন, কোন কোন সময় নিরম্বু উপবাস করে একাধিক দিন নাকি পুজোর ঘরেই কাটিয়ে দিতেন। পুত্রের প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা তাঁকে প্রায় অন্ধ করে দিয়েছিল। তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়া, কালীমন্দিরে মনোবাসনা পূরণের জন্য পাঁঠা বলি দেওয়াও বাদ যায় নি। এমন কি দৈব ওষুধ তাঁর স্ত্রীর জন্য পেতে তিনি বীরভূমের এক গণ্ডগ্রামে গিয়ে (বেলে) এঁদো পুকুরে স্নান করে পুকুরের শ্যাওলা ও সেখানকার তেল এনেছিলেন।

ডায়মন্ডহারবার থেকে কিছুটা দূরে কোন এক তান্ত্রিক সাধক মন্ত্রবলে রোগ নিরাময় করতে পারেন জেনে তিনি তারই কাছে ছুটেছেন। অন্ধকার ঘরে নানা ভোজবাজি দেখে মন্ত্রপূত শিকড় নিয়ে ফিরেছেন স্ত্রী-র জন্য। কিন্তু সবই ব্যর্থ, ধীরে ধীরে কবির মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। জীবনীকারেরা অনেকেই বলেন যে, নজরুল অল্প বয়স থেকেই অঘোর-পন্থী সাধকদের সঙ্গ করতেন।

যা হোক, যে কারণেই হোক, নজরুল শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন মুসলমান হয়েও। আমরা নজরুল ছাড়াও মৃধা হুসেন আলির পদ পেয়েছি। আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত যাঁরা হতে পেরেছিলেন তাঁরাই অন্য পথে স্বচ্ছন্দ মনে যেতে পেরেছিলেন। নজরুল ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি নিয়ম-কানুন যত না মেনেছেন তার চেয়ে হিন্দু নিয়ম-কানুন বেশি মেনেছেন—হতে পারে হিন্দুরমণী প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করা তার কারণ। নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ—'আয় অশুচি আয় রে পতিত, এবার মায়ের পূজা হবে/যেথা মানব জাতির সকল মানুষ নির্ভয়ে মার চরণ ছোঁবে।।"

নজরুল শুধু শ্যামাপূজা করতেন বা আরাধনা করতেন তা-ই নয়। শোনা যায়, তিনি দুর্গামন্দিরে যেতেন পট্টবস্ত্র পরে, পূজা দিতেন।

আসলে তাঁর কাছে কালী-দুর্গা সবই একই রূপের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র ছিল। তাঁর লিখিত শ্যামাসঙ্গীত ভক্তিগীতিই, কোন তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রচিত নয়। শাক্ত পদাবলীর মত মায়ের বিভিন্ন রূপের বিভাজন তাঁর শ্যামাসঙ্গীতে ছিল না। তবে শক্তিদেবীর শাস্ত্রীয় বিভিন্ন রূপের মহিমাগান তিনি করেছিলেন—সতী, উমা, চণ্ডীকা, মহাকালী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, ভ্রামরী প্রভৃতি।

সতী— ঘরছাড়াকে বাঁধতে এলি
কে মা অশ্রুমতী?
লীলাময়ী মহামায়া
দাক্ষায়ণী সতী।।

উমা— সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে।
শ্মশানবাসী হরের গলায় বরণ-মালা দুলাতে।।
সতীর শোকে ভৈরব-বেশ
প্রলয় ধ্যানে মগ্ন মহেশ,
(তাই) নেমে এলি হিমালয়ে অটল শিবে টলাতে।।

চণ্ডীকা মহাকালী —নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
মাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী।

রক্তদন্তিকা— জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা রক্তদন্তিকা

শতাক্ষী — নীলোৎপল নয়না নীলবর্ণা শাকম্ভরী
শত চোখে শতনীল পদ্ম ফুটিয়াছে মরি মরি।

ভ্রামরী— মা গো কে তুই, কার নন্দিনী
ভ্রমর লয়ে মা করিস্ খেলা।
তনুতে মা তোর সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা।।

এসব গানের মধ্যে আসলে দেবী মহিমা বর্ণনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। 'দেবীস্তুতি'-তে নজরুল 'প্রস্তাবনা' অংশে নারায়ণী দুর্গার স্তবগান করেছেন—

প্রণমামি শ্রী দুর্গে নারায়ণি
গৌরি শিবে সিদ্ধিবিধায়িনী।
মহামায়া অম্বিকা আদ্যাশক্তি
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদায়িনী।

তিনি আরো লিখেছেন: "মা ব্রহ্মময়ী। তুমি চিন্তার অতীত হইয়াও সাকার শক্তি স্বরূপা। ......তুমি নির্গুণা....কেবলমাত্র অনুভবের সামগ্রী। মা! তুমি পরব্রহ্ম রূপিণী।"

"যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই পরমাত্মা। অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন, জল ও তাহার শীতলতা যেমন অভিন্ন, পরমাত্মা ও আদ্যাশক্তিও তেমনি অভিন্ন।

আদি অন্তহীন কালের বক্ষে লীলা করেন বলিয়া তিনি কালী। বিশ্বের সকল কিছুকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। তিনিই শিব, তিনিই রাম, তিনিই হ্লাদিনী শক্তি রাধা। বিশ্বের সকল জড়জীব বিভিন্ন নামে তাঁহাকেই উপাসনা করে। ...তিনি নির্গুণা, নিরাকারা, চৈতন্যরূপিনী, কেবল অনুভবসিদ্ধা,...। তিনিই আদি পিতা, তিনিই আদি মাতা, অথচ তিনি পুরুষও নন নারীও নন।

জীব যখন তাঁকে পিতা, স্বামী, সখা-রূপে উপাসনা করে, তখন তিনি পুরুষরূপে দেখা দেন। যখন মাতা বলিয়া, কন্যা বলিয়া স্তুতি করে, তখন তিনি নারীরূপে আবির্ভূতা হ'ন।.... যোগদৃষ্টিসম্পন্ন পূর্ণ জ্ঞানীর কাছে যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। .....এই আদ্যাশক্তি যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্মা, যখন পালন করেন তখন তিনি বিষ্ণু, যখন সংহার

করেন তখন তিনি রুদ্র। আবার যখন তিনি নিত্যরাসলীলা করেন, তখন তিনি কৃষ্ণ।

.......আমরা ....আনন্দরূপিনী মহাশক্তিকে.......আত্মারামের ঘর জ্বালাইবার কাজে লাগাইয়া সংসার কারার ঘানি টানিয়া মরিতেছি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া। বিষয় বুদ্ধি দোষ-দুষ্ট সাংসারিক লাভালাভের জন্য যাঁহারা তাঁহার তপস্যা করে তাহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক দুঃখ শোকাদিও ভোগ করিতে হয়।"

রামপ্রসাদের পদ মনে পড়ে—

কালী হলি মা রা
নটবরবেশে বৃন্দাবনে
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।।
সাধকের কাছে "মহাকাল কানু শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নারি ।।"

নজরুল আদ্যাশক্তিকে পরমেশ্বরী কালিকা, জগদম্বিকা, ভবানী-ত্রিলোক পালিকা রূপে দেখেছেন। আদ্যাশক্তির বিশেষ রূপধ্যান তিনি করেছিলেন তা হল মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। তাঁর একটি গানেই আছে—

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক-পালিকা।।
মহাকালী মহাসরস্বতী,
মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী,
তুমি বেদমাতা, তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা।
কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—মা মহামায়া, তব মায়ায়
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয়, সমুদ্রে জলবিম্ব প্রায়!
অচিন্ত্য-পরমাত্মা-রূপিনী
সুর নর-চরাচর প্রসবিনী—
নমস্তে শিবে অশুভ-নাশিনী তারা মঙ্গল সাধিকা।।

(ভৈরবী-তেওরা)

নজরুল বলেছেন : "যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের উৎপীড়ন চলে, ... তখনই তাঁহার শক্তি অবতাররূপে প্রকাশিত হয়।...... তখনই অসুরশক্তির সংহার করিয়া তিনি জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।" অর্থাৎ জীবের কল্যাণের জন্যই মহাশক্তির অবতাররূপে আবির্ভাব ঘটে। মধু-কৈটভের যে কাহিনী প্রচলিত তার ব্যাখ্যায় নজরুল লিখছেন : "মধু কৈটভ আর কেহ নয়, অধৈর্য ও অবিশ্বাস নামক দুই দৈত্য। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভের উৎপত্তি। বিষ্ণু অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার কর্ণমল অর্থে, আমি মনে করি, দিবারাত্রি আমরা পণ্ডিতগণের নিকট যে বিচার তর্ক শুনি—তাহাই।" এই আদ্যাশক্তি যখন পরমাত্মা বিষ্ণুর অর্থাৎ সত্ত্বগুণের শরণাপন্ন হন তখন দুই দৈত্য নিহত হয়।

"......দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মী...। এই রূপে তিনি মহিষাসুর বধ করেন। আমাদের দেশে শ্রীদুর্গারূপে ইনি পূজিতা হন। প্রথম অবতার মহাকালীরূপা পরমাত্মার সংহার শক্তি।

দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মী রাষ্ট্রীয় শক্তি। এই মহাভারত যখনই তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি হারাইয়াছে তখনই মহালক্ষ্মী রূপিণী শ্রীদুর্গার শরণাপন্ন হইয়া সে তাহার বিলুপ্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এই রূপেই পূজান্তে বরলাভ করিয়া রাবণকে নিহত করিয়া ভারতের ধর্ম অর্থ শ্রী সম্পদরূপিণী সীতার উদ্ধার করেন। ....সমস্ত দেবশক্তি একত্রীকৃত হইলে অবলুপ্ত স্বর্গ বা রাষ্ট্রীয় শক্তি উদ্ধার হয়। ......মহিষাসুর ক্রোধের প্রতীক। ক্রোধই অশান্তি, অতৃপ্তি, বিরোধ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বিধা, সন্দেহ প্রভৃতি অকল্যাণের হেতু।.............এই ক্রোধরূপী মহিষাসুর নিধনপ্রাপ্ত হইলেই অতৃপ্তি, অশান্তি, বিরোধ, হিংসা, কলহ প্রভৃতি জগতের সমস্ত অকল্যাণ বিদূরিত হয়।''

আদ্যাশক্তির তৃতীয় অবতার 'মহাসরস্বতী'—যিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক কামনা বাসনার প্রতীককে হত্যা করে ত্রিলোকে শান্তি স্থাপন করেন। শুম্ভকে নজরুল বৈশ্যশক্তির এবং নিশুম্ভকে শূদ্র শক্তির প্রতীক বলে ভেবেছেন। কামনা বাসনামুক্ত হতে না পারলে জীবের পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ মেলে না। শুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত কামনা-বাসনার অবসানও হয় না। 'মহাসরস্বতী' সেই শুদ্ধজ্ঞানের দেবী। নজরুলের ভাষায় : "মহাকালী দেন তেজ বা ব্রাহ্মণের তপস্যা, মহালক্ষ্মী দেন প্রেম, মহাসরস্বতী দেন জ্ঞান। এই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপিণী ত্রিধারা শক্তিই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা।''

নজরুলের কাছে এখানে দেবী দুর্গা এবং কালীর মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান প্রাধান্যলাভ করে নি। সাকার হয়েও তিনি নিরাকার, নিরাকার হয়েও কখনো কখনো সাকার। নজরুলের এই অভেদ উপলব্ধি নতুন কিছু নয়। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছিলেন : "যেখানে যাহা কিছু হইতেছে, যেখানে যে-কেহ যাহা কিছু করিতেছে—এই সকল হওয়া ও করা ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই সর্বব্যাপিণী শক্তি। তিনি সর্বশক্তিমান—সেই সর্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিই সর্বক্রিয়ার মূল কারণ, সর্ব-জ্ঞানের মূল কারণ; এই জ্ঞান—ক্রিয়াত্মিকা বিশ্বব্যাপিনী শক্তিই তো দেবী—তিনিই মহামায়া।.....শক্তিমান ও শক্তি অভেদ....এই যে শক্তি ও শক্তিমানের মূল অভেদত্ব সত্ত্বেও অভেদে-ভেদকল্পনা করিয়া শক্তির মহিমা প্রকাশ, এইখানেই ভারতীয় দার্শনিক শক্তিবাদের বীজ।......শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিয়া তাহাতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা ও মহিমা আরোপ করিয়া স্বীয় মহিমায় শক্তির প্রতিষ্ঠা—ইহাই ভারতীয় শক্তিবাদের অভিনবত্ব।'' নজরুল লিখেছেন—

আমার মা যে গোপাল-সুন্দরী
একবৃন্তে কৃষ্ণকলি, অপরাজিতার মঞ্জরী।।
(সে) আধেক পুরুষ আধেক কৃষ্ণা নারী
অর্ধকালী অর্ধ বংশীধারী....''

রামপ্রসাদের পদেও আমরা একই ভাবনা লক্ষ করেছি—

ও জননি, অপরা জন্ম-জরা-হরা-জননী।
অপারে, ভব-সংসারে, একতরণী।
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব ভেদভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মারূপিনী।

সেই একই ভাবনা রামলাল দাসদত্তের পদেও পাই—

শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু ভক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি :—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম দুর্গা কালী রাধা শ্যাম।
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।।

কিম্বা, রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) এর পদেও একই সুর শুনি—

'তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া, মহাবিষ্ণু
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে।।'

জাতিতে মুসলমান হয়েও হিন্দুর শ্যামাসঙ্গীতে এই ভক্তি-বিভোরতা সত্যই দুর্লভ। সমস্ত জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে 'মা' নামই নজরুলের কাছে সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই একটি সুপ্ত শিশু থাকে, জীবনের অসীম যন্ত্রণায় রণক্লান্ত মানুষ তখন চায় মায়ের শান্তির কোল—যেখান থেকে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার উপশম ঘটতে পারে। যদিও তাত্ত্বিকভাবে নজরুল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত মনোভাব ছিল "আমাকে খুঁজছ কোথায়, আমি মন্দিরে, মসজিদে কাবা বা কৈলাসে কোথাও নেই, আমি আছি মানুষের অন্তরে"—এই অন্তর্লোকেই ঈশ্বরের প্রকৃত অধিষ্ঠানক্ষেত্র। মা-কে ডাকার জন্য কোন বিশেষ ধর্মে দীক্ষা বা মন্ত্র-তন্ত্র জানার প্রয়োজন নেই, মনোদীক্ষাই যথেষ্ট। ফিকিরিচাঁদ বাউল তাই বলেছেন—

দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষ্ণকাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়—
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।।

নজরুলের ওই শাস্ত্র ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের কাছে শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করেছে, মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ করেছে।

রামপ্রসাদ বা শাক্তপদাবলীতে উল্লিখিত কবিদের গান এবং তার ভাবসম্পদ থেকে নজরুলের গানের ভাবসম্পদকে যে সবসময় পৃথক করা যায়, এমন নয়। হৃদয়ের দরদে অনেক সময় নজরুলের গানকে রামপ্রসাদী গান বলেও ভুল হয়ে যেতে পারে। যেমন— "কালো মেয়ের পায়ের তলায়" গানটি যে নজরুলের রচনা তা বোধহয় অনেকেই জানেন না।

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে সংসার বৈরাগ্যের কথা আছে—

দারা-সুত-পরিজন রূপে প্রভু অনুক্ষণ,
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন,
তুমি যবে চাও মোরে লও হে তাদের হয়ে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়াডোর ক্রোড়ে ধর আপন।

আত্মনিবেদনের ভাবটিও তাঁর গানে আছে—

তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় কি করি হরি
দাও ব্যথা যতই তোমায় ততই নিবিড় করে ধরি
আমি ভয় কি করি হরি।।

একসময় নজরুল দুঃখ যন্ত্রণা বেদনাক্রান্ত জীবন থেকে ভগবৎ প্রেমে লীন হয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি একটি গানে বলেছেন—

মাগো আমি তান্ত্রিক নই তন্ত্রমন্ত্র জানি না মা।
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।

নজরুল মনেপ্রাণে একজন যথার্থ শক্তিপূজক ছিলেন, তাই বলতে পেরেছিলেন—

শক্তিপূজা কথার কথা না (শ্যামা)
যদি কথার কথা হোত চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন হোত না।

দেশমাতৃকা ও শ্যামা মাকে এক করে নজরুল লিখলেন—

জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা/আবার রণচণ্ডী সাজে
তুই যদি না জাগিস মাগো/ছেলেরা তোর জাগবে না যে।।
অন্নদা! তোর ছেলে মেয়ে/অন্নহারা ফেরে ধেয়ে,
বাঁচার অধিক আছি ম'রে/দেখে কি প্রাণে না বাজে।।
শ্মশান ভালোবাসিস্ যে তুই,/ভূ-ভারত আজ হল শ্মশান,
এই শ্মশানে আয় মা নেচে,/কঙ্কালে তুই জাগা মা প্রাণ।
চাই মা আলো মুক্ত বায়ু/প্রাণ চাই, চাই পরমায়ু,
মোহ-নিদ্রা ত্যাগ কর্ মা/শিব জাগা তুই শবের মাঝে।।

ভারতের এই শক্তিহীনতার কারণ হিসাবে নজরুল দায়ী করেছেন আপন স্বার্থচিন্তাকে। স্বার্থের জন্য দেশের মানুষ শক্তি পূজা করেছে বলে তিনি মনে করেন, কিন্তু তারা নিছক ভক্তিনত চিত্তে শক্তিকে পাবার জন্য আত্মসমর্পণ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে স্বদেশ প্রেমের যে মন্ত্র দিয়েছিলেন (বন্দেমাতরম্), সেই মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে বহু সাধক মৃন্ময়ী দেশমাতৃকার মধ্যে চিন্ময়ী সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। ব্রহ্মচারীর পশ্চাৎ দেবালয়ে প্রবেশ করে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দৃষ্টিপাত করে মহেন্দ্র দেশমাতৃকার অতীত রূপ "মা যা ছিলেন" প্রত্যক্ষ করেছিল : "এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৌস্তুভ শোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায়.............। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধির প্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িত কুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তা.....। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান রাগরাগিণী......। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।"

"মা যা হইয়াছেন" সেইরূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন : "কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন— হায় মা!"

"মা যা হইবেন"—রূপের বর্ণনায় দেখি "দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—

বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয় কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ;"— দুর্গা কালী সব মিলে মিশে একাকার। এই হল দেশমাতৃকার রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দেবীই দেশমাতৃকা। দেশমাতৃকার আরাধনাকে বিশ্বজননীর উপাসনা বলে তিনি মনে করেছিলেন। নজরুলও ভারতবর্ষের শক্তি যে যথাবিধি শক্তি-উপাসনার মধ্যেই নিহিত আছে সেকথা বিশ্বাস করতেন। তাঁর "নন্দলোক হতে আমি এনেছিরে মহামায়ায়" গানে যে কৃষ্ণকে কবি নন্দালয়ে রেখে এলেন তিনিই সারা বিশ্বে শঙ্খধ্বনি করবেন, নারায়ণীর কৃপায় নারায়ণী সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। যুদ্ধ হবে সকলপ্রকার অশুভের বিরুদ্ধে। আধুনিক কবিরা 'শ্মশান' শব্দটি বার বার ব্যবহার করেছেন নিজেরা তান্ত্রিক সাধক না হয়েও। যেমন, অশ্বিনীকুমার দত্তের "এতবড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথায় পেলি!"—মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের শ্মশানময় দেশ-কালকেই হয়ত 'শ্মশান' শব্দের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

শাক্তকবিদের প্রতিবাৎসল্যের মত নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতেও প্রতিবাৎসল্যের পদ আছে—

মা মেয়েতে খেলব পুতুল আয় মা আমার খেলাঘরে।
আমি মা হয়ে মা শিখিয়ে দেব পুতুল খেলে কেমন ক'রে।।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের সুর ছিল প্রসাদীসুর। অবশ্য শাক্তগীতিতে প্রসাদী সুরের বহুল ব্যবহার থাকলেও সব শাক্তগীতিই প্রসাদী সুরে গাওয়া হত না। প্রসাদী সুর মূলত হাম্বীর রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। নজরুলের অন্যান্য গানের মতই শ্যামাসঙ্গীতেও সুরের অসামান্য বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গানই কোন-না কোন রাগ এবং তালের উপর ভিত্তি করে রচিত। ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে নজরুলই প্রথম সুরের গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গানে শক্তিদেবীর পরাক্রমের প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে আত্মনিবেদনের কথাও; আবার শক্তিমহিমাগানও তিনি রচনা করেছেন। যেমন—

(ক) মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
পরমাপ্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক পালিকা। (ভৈরবী রাগ)
(খ) মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে/ হাত ধ'রে মোর নিয়ে যা মা।
পথ নাহি পাই যেদিকে চাই/দেখি আঁধার ঘোর ত্রিযামা।।
আমি নিজে পথ চলিতে যাই/বারেবারে পথ ভুলি মা তাই
মায়া-কূপে পড়ে কাঁদি/কোথায় দয়াময়ী শ্যামা।। (হাম্বীর রাগ)
(গ) কে পরালো মুণ্ড-মালা/ আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্রদল জীবন-কমল/ দোলেরে যাঁর চরণ-তলে।।

নজরুলের শ্যামা বিষয়ক গানের কোথাও কোথাও কীর্তনের সুরের ছোঁয়া আছে। বাউল ভাটিয়ালী মিশ্র রীতির শ্যামাসঙ্গীতও আছে—

'মা এসেছে মা এসেছে উঠ্‌ল কলরোল। দিকে দিকে বেজে ওঠে সানাই কাঁসর ঢোল।।'

'কালী-কীর্তন' অঙ্গের গানে কীর্তনের ছোঁয়া আছে—

মা'কে আদর ক'রে কালি বলি সে সত্যি কালো নয়রে।

তার ঈষৎ হাসির এক ঝলকে জগৎ আলো হয় রে, /ত্রি-জগৎ আলো হয় রে।।

কীর্তনাঙ্গের অপর গান—

(আমার) মা যে গোপালসুন্দরী। /এক বৃন্তে কৃষ্ণ-কলি অপরাজিতার মঞ্জরী।।

(সে) আধেক পুরুষ আধেক কৃষ্ণা নারী/অৰ্দ্ধ কালি অৰ্দ্ধ বংশীধারী;

(মা) অৰ্দ্ধ অঙ্গে পীতাম্বর আধেক সে দিগম্বরী।/মা যে গোপাল সুন্দরী।।

নজরুলের শ্যামাবিষয়ক গানের সুরবৈচিত্র্য, তাত্ত্বিক অনুভূতিকে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা, শ্যামা মা-কে দেশমাতৃকার প্রতীকরূপে দেখা, মহাশক্তির দ্বারা অশুভ শক্তির বিনাশ আকাঙ্ক্ষায় সুন্দর কল্যাণ চৈতন্যস্বরূপের আহ্বান অসাম্প্রদায়িক ভাবনা সব ক্ষেত্রেই তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন অন্যান্য ভাবের ক্ষেত্রে শক্তিসাধক কবিদের কাছাকাছিই নজরুলের নাম উচ্চারণ করা যায়। আসলে নজরুল যে কথা 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে বলেছিলেন যে, চিরন্তন সত্যের উপরেই সব ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়—সেটিই মূল কথা। চিরন্তন সত্য হল— মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়— তাঁর বিভিন্ন রূপ মানুষের সৃষ্টি, মনই ঈশ্বরোপসনার প্রকৃত স্থান ইত্যাদি। তিনি মুসলমান হয়েও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই ভক্তিগীতি সংখ্যায় প্রচুর লিখেছেন। ধর্মের সংকীর্ণতায় কলুষ, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, ধর্মীয় নানা কুসংস্কার পরধর্ম অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন নজরুল।

শক্তিদেবী সম্পর্কিত পদরচনার আধুনিক চর্চা বহু কবি করেছেন, তাঁদের সকলের নাম হয়ত উদ্ধার করা কোনকালেই সম্ভব হবে না। শোনা যায়, রামপ্রসাদ নাকি দিনে ৫টি করে গান রচনা করতেন। সেক্ষেত্রে তাঁর নামেই যত সংখ্যক গান পাওয়ার কথা তার অর্ধেকও পাওয়া যায় না—সবই কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে।

নজরুলের গান

মাঝে মাঝে একটা কথা মনে হয় যে, আমরা যারা বাঙালি হয়ে জন্মেছি, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীতের জগতে অবগাহন করতে পেরেছি, বাঙালির অনুভব নিয়ে বিশ্বকে, মানুষকে, মানবিক নানা সূক্ষ্মভাব ও ভাবনাকে অনুভব করতে পেরেছি, তারা বলতেই পারি 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। ইতিহাস নয়, ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়--বাংলা গানের অযুত ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে রয়েছি আমরা—এ বড় কম গর্ব এবং সৌভাগ্যের কথা নয়। বাংলা গানের জগতে যে-সব শ্রদ্ধেয় নাম নির্দ্বিধায় লেখনীর মুখে এসে পড়ে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল। সমস্ত সূক্ষ্মতার প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে অগ্রণী।

বেশ কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্রসংগীতের প্রবল জোয়ারে দেশকাল ভেসে যাচ্ছে। এর থেকে এমন মনে করা অবশ্যই যেতে পারে না যে, এই প্রবল জোয়ারের দোলায় যাঁরা ভেসে গিয়েছেন তাঁরা সবাই রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক বোদ্ধা। বরং গায়ক-গায়িকা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর মর্মে ক'জন গায়ক-গায়িকা কিংবা ক'জন শ্রোতাই বা প্রবেশ করতে পারেন? তবে কি এই জোয়ার নিছকই একটা হুজুগ? একেবারে নয়, এমন বলি না। তবুও মনে হয়, গায়ক-গায়িকা বা শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর মর্ম না বুঝেও কোথাও একটা সম্ভবত সহমর্মিতা অনুভব করেন। বিশেষ বিশেষ গানের ভাব শ্রোতার মনের মধ্যে এমনই এক ব্যাকুলতা তৈরী করে যাকে বলা যায় "একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে।" 'ছন্দ' গ্রন্থের 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে। যে-মানুষ রচনা করে আর যে-মানুষ ভোগ করে।"গানের রাজ্যে অবশ্য আরও একজন আছেন, তিনি গায়ক। গায়ক তাঁর অনুভব ও প্রকাশক্ষমতা দিয়ে গানের ভাবকে যদি শ্রোতার অনুভূতির দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন তবেই সার্থকতা গায়কের আর সহমর্মিতা শ্রোতার।

যে-কোনও সংগীতের মুখ্য আশ্রয়—কথা এবং সুর। বাণীপ্রধান সংগীত এবং সুরপ্রধান সংগীত—এই দুইয়ের মধ্যে কার গুরুত্ব অধিক তা এককথায় বলা সহজ নয়। তবে সাধারণত বাণীকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলার স্বাভাবিক প্রবণতা তো আছেই। 'সমালোচনা' গ্রন্থের 'সংগীত ও কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগ রাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগ রাগিণী।....কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।" সুতরাং বাণীপ্রধান গান বলতে ভাবপ্রধান গানকেই বোঝায়। তবে সংগীতে সুরের স্থানও বিন্দুমাত্র নগণ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ ভাব বিশেষ বিশেষ সুরের অপেক্ষায় থাকে আবার বিপরীতটিও

সত্য। এইভাবে বাণী ও সুরের রাজযোটক মিলনেই সংগীতের প্রকৃত সার্থকতা। এই দুইয়ের হরগৌরী মিলনে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে এক অনির্বচনীয় অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেই বলা যায়,"সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।" তবে তিনি একথাও বলেছেন, "কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে সংগীত ততখানি করে নাই।" হয়তো এই কারণেই অনেক সময় আমরা উপলব্ধি করি যে, খুব উন্নত ভাব না হওয়া সত্ত্বেও সুরের মোহের আকর্ষণে কোনও কোনও গান আমাদের অনুভবতন্ত্রীতে একটা অনুরণন তোলে যার মায়াজাল ছিন্ন করা প্রকৃত গীতরসিকের পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কথা ও সুর উভয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন— "কথাও যতখানি ভাবপ্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে।...ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে।...যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে।"—রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে।

অতএব সংগীতের কথা ও সুর অর্থাৎ ভাব ও সুর উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য স্থান। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে নজরুলের গানকে বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। নজরুল গান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "গানের কথার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভাবি গানের সুরের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি।" কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রোতা যদি গানের সঠিক বোদ্ধা হন তবে গানের কথা বা ভাব তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যদি সঠিক উপলব্ধ হয় তবে শ্রোতার কাছে কথা থেকে সুর পৃথক হয়ে থাকে না। অনেকে আবার গান শুনে তৃপ্ত হন, কিন্তু তৃপ্তিটুকু গানের কথা অথবা সুর কিসের জন্য তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সাধারণ শ্রোতা যার সুরজ্ঞান তত প্রখর নয়, তিনি গানের কথাকেই অধিকতর মর্যাদা দেন এবং সুরকে কথার পিছনে পিছনে অনুগতা স্ত্রীর মতো মনে করে তৃপ্তিলাভ করেন। নজরুল সংগীতে বাণী ও সুর—কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয়ের সহাবস্থান, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুরেরই ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ অস্বীকার করার নয়। রবীন্দ্রসংগীতে সর্বত্রই বাণী ইন্দ্রিয়লোক পরিত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় পৌঁছে যায় এবং সেটাই নিঃসংশয়ে আমাদের কাছে চূড়ান্ত প্রাপ্তি—নজরুল সংগীতে অবশ্য সম্পূর্ণ তেমনটি নয়। নজরুলের গানে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার চেয়ে মানবিক আবেদন অনেক বেশি। যখন শুনি "মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা" তখন গানের কথা শ্রোতাকে উদাসী ও বেদনার্ত করে তোলে ঠিকই, কারণ গানের কথার মধ্যে যে মানবিক বিরহ-বেদনার আর্তি ঝরে পড়ে তাকে অস্বীকার করবে শ্রোতা কেমন করে? আবার ধরা যাক "ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হায় সন্ধ্যায়"—এ পূরবীর সকরুণ বেদনায় কত অতীত রুদ্ধ দুয়ার নিমেষে খুলে গিয়ে এক বোবাকান্নায় সমস্ত সত্তা কি আলোড়িত হয়ে ওঠে না? হয়তো মনে হতে পারে যে, এই উদাহরণগুলির সবই করুণরসাত্মক বলেই তার একটা স্বাভাবিক আবেদন আছেই। সে কারণেই "এত কথা

কি গো কহিতে জানে চঞ্চল ঐ আঁখি", "সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়াছিলে", "তুমি আমার সকাল বেলার সুর", "আমার ঘরের মলিন দীপালোকে" এইসব গানে প্রেমের যে ব্যাকুলতা তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। এখানে শ্রোতার শিক্ষার প্রয়োজন তত নেই যত আবেগ ও অনুভবের প্রয়োজন আছে। শ্রোতার অন্তরে অনুভবের তারে গানের কথা ও সুরের অনুরণন জাগে আর সেখান থেকেই সমস্ত সত্তা আবেগাপ্লুত হয়। আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেম-বিরহ যেন প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠে এসেছে নজরুলের গানে, আর সে কারণেই নজরুলের গানকে অনেক বেশি বাস্তব জীবনের উষ্ণতায় ভরপুর বলে মনে হয়। সমালোচক বীরেন ভট্টাচার্য বলেছিলেন—"নিরক্ত প্রেমের গান প্রাণবন্ত হয়ে উঠল নজরুলের হাতে।" ১৯২৮ সালের সাপ্তাহিক সওগাতে নজরুল সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার প্রাণ মাতানো সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর হইতে অনবরত 'গান' 'কবিতা', 'নজরুলের গান চাই কবিতা চাই', প্রভৃতি ঘন ঘন চিৎকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। সকলের অনুরোধে এ দিনও কবি তাঁহার মধুর সঙ্গীত ও কবিতায় সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার করেন।"—'নজরুল ও সাময়িক পত্র' গ্রন্থে মোবাশ্বের আলী 'সওগাত' পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে একথা জানিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, নজরুলের গানের গলা মোটেই ভাল ছিল না, একটা ভাঙা বা ধরা আওয়াজ ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর গানের এই চাহিদাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, কথায়-সুরে এমন এক উন্মাদনা, এমন এক উষ্ণ আবেগ ও আবেশ ছিল যা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখত আর সে কারণেই তাঁর গানের চাহিদাও ছিল অফুরন্ত।

নজরুলের প্রেমের গানগুলি অসামান্য। এই গানগুলি শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটিই কানে বাজে—" যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গাযমুনাসংগম।" আর ঠিক এই কারণের জন্যই নজরুলের যে-কোনও গান এত আন্তরিক হতে পারে। এখানে গানের বাঁধনদার আর গায়ক তো একই ব্যক্তি, ফলে মমত্বের অভাব বিন্দুমাত্রও ঘটে না। প্রেমের গানগুলির রসভাণ্ডার নিঃশেষিত হতে চায় না যেন। যদিও একথা ঠিক যে, নজরুলের প্রেমের গান মানবিক উষ্ণতায় ভরপুর, তবু বলি, সে উষ্ণতায় কোনও কাঙালপনা নেই, আছে শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক মুগ্ধতা, সৌন্দর্যে মগ্নতা। জীবনকে মানবিক আবেগের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা আছে এসব গানে, নেই কোনও স্থূলতা। নজরুল যখন লেখেন—"তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ"—তখন সুন্দরকে দু-চোখ ভ'রে দেখার জন্য প্রেমিকার আকুলতা নিঃশেষে ঝরে পড়ে। প্রিয়তমা তার প্রিয়তমের প্রতি আকর্ষণকে কখনও চাঁদ-চকোরিনী, কখনও সূর্য-সূর্যমুখীর উপমায় রঞ্জিত করে। প্রতিটি উপমার মধ্যেই সুন্দরকে দেখার নিষ্পাপ দৃষ্টিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ জগতে সুন্দরকে কোন্ মানুষ না দেখতে চায়? কবির বিধিপ্রদত্ত ডাগর আঁখি দুটি যেন সুন্দরকে দেখার

জন্যই পাওয়া। সমস্ত অসুন্দরকে বর্জন করে যিনি এমন করে সুন্দরের আরাধনা করতে পারেন তাঁর গানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় কি? সুন্দরকে দেখার এই আকুলতা কেবলমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই নয়, যেখানে নজরুল বলেন "একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী", কিম্বা খোদার মেহেরবাণীতে যেখানে সুন্দর ফুল আর মিঠানদীর পানি-দ্বারা সমৃদ্ধ শস্য-শ্যামল এই বাংলাদেশের কথা বলেন অথবা ভক্তিমূলক গানে শ্যামার রূপবর্ণনায় যখন গীতিকার লেখেন "আমার মা যে গোপাল সুন্দরী। যেন এক বৃন্তে কৃষ্ণকলি, অপরাজিতার মঞ্জরী।।" কিংবা "আমি সুন্দর নহি, জানি হে বন্ধু, জানি। তুমি সুন্দর, তব গান গেয়ে নিজেরে ধন্য মানি।।" সেখানেও যেন নজরুলের মনের কথাটি স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে যায়—

আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে,
সুন্দর যা'রা, তাদের দেখিতে।
রূপ-সুন্দর-দেবতার পায়
অঞ্জলি দিই বাণী।।
রূপের তীর্থে তীর্থ-পথিক যুগে যুগে আমি আসি,
ওগো সুন্দর! বাজাইয়া যাই তোমার নামের বাঁশি।
পরিয়া তোমার রূপ-অঞ্জন,
ভুলেছে নয়ন, রাঙিয়েছে মন।
উছলি' উঠুক মোর সঙ্গীতে
সেই আনন্দখানি।।

এই সৌন্দর্য আরাধনার ক্ষেত্রে দেশ, দেবী এবং নারীতে কোনও পার্থক্য নেই। সকল ক্ষেত্রেই নজরুলের রূপারাধনার স্বপ্নমেদুরতা ও নির্মলতা যেন আমাদের সমস্ত স্থূলতা, সংকীর্ণতা ও তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। এসব সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে সর্বদা যে কোনও অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রগাঢ়তা আছে, তা নয়। কিন্তু মানবিক যে ভাল-লাগার আবেশ, তারই বা মূল্য কম কি? এমন করে নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখতে শিখলেই তো অতীন্দ্রিয় অনুভবে পৌঁছনো সম্ভব হয়। নজরুলের গান যেন সেই প্রচেষ্টারই সফল প্রয়াস।

নজরুল এপার বাংলার অথবা ওপার বাংলার কবি এই বিতর্ক যেমন অর্থহীন বলে মনে হয়, তেমনি অর্থহীন মনে হয় তিনি সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক—তার বিচার। নজরুল যে ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন সেখানে হিন্দুর দেবদেবী এবং ইসলামের আল্লা দুই-ই আছেন এবং উভয় গানের মধ্যেই গীতিকারের আন্তরিকতা ও ভক্তির লেশমাত্র কম-বেশি নেই। গীতিকার যখন লেখেন—

আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।।
আমার কিসের শঙ্কা?
কোর্‌আন্ আমার ডঙ্কা,

ইস্‌লাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।।

তখনও ইসলামের প্রতি যে ঐকান্তিকতা ও নির্ভরতা দেখি, ঠিক তাই দেখি যখন তিনি লেখেন—

বল মা শ্যামা বল,— তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে?
আমি, যতই দেখি ততই কাঁদি, ঐ রূপ দেখি মা সকল খানে।।
মাতৃহারা শিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে
চোখ ফিরাতে নারে মাগো, কাঁদে বুকে রেখে।
তোর মূর্ত্তি মোরে তেমনি ক'রে টানে মাগো মরণ টানে।
তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে।।

নজরুলের মতো একজন ইসলামি লেখকের পক্ষে কেমন করে এহেন শ্যামাসংগীত কিংবা "সখী, আমিই না হয় মান করেছিনু তোরা তো সকলে ছিলি; / ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি, কেন নাহি ফিরাইলি"-র মতো কীর্তন লেখা সম্ভব হল ভাবলে বিস্মিত হতে হয় বইকি! কিন্তু এর সমাধান তেমন কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে 'আল্লা'ই বলি, কিংবা 'ভগবান', 'কৃষ্ণ'—গীতিকারের মনের মধ্যে থাকে সেই বিশ্বশক্তির ছবি যা সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত হয়ে থাকে। ইংরাজিতে যাকে বলি 'Power' —তা নারী অথবা পুরুষ, হিন্দু অথবা মুসলিম—এইসব বিতর্কের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। মনে হয়, নজরুল অধ্যাত্মচেতনার সেই একটা জায়গায় পৌঁছতে পেরেছিলেন যেখানে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রতি মানুষের যে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন—তাই প্রথম ও শেষ কথা। তাই একই লেখনী লেখে "আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়" এবং "তুমি আনন্দ-ঘনশ্যাম, আমি প্রেম পাগলিনী রাধা।" এখানে শুধু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, হিন্দু অথবা মুসলমানের নয়। বস্তুত নজরুলের মনের কথা তাঁর নিজেরই রচনার উল্লেখ করে বোঝানো যায়—

কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
সে যে রে তোর মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ সে তোর মাঝে রয়।
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস যারে পাহাড় জঙ্গলময়।
চেয়ে দেখ সে তোর মাঝে রয়।
আঁখি খোল ইচ্ছা অন্ধের দল
নিজেরে দেখ না আয়নাতে
দেখিবি তোরই এই দেহে
নিরাকার তাঁহার পরিচয়
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর;
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর

এ দেহের আধারে গোপন
রহেরে বিশ্ব চরাচর,
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশ্‌তে, স্বর্গে—কোথাও নয়।।
এই তোর মন্দির, মসজিদ্‌
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল্‌
কোথা তুই তীর্থে যাবি মন
এই তোর মক্কা-মদিনা;
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।।

নজরুল যেখানে কীর্তন রচনা করেন সে গানের সৌন্দর্যেও মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। স্কুল-পালানো ভবঘুরে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মনটিকেও কোথাও নির্দিষ্ট বাঁধনে বেঁধে রাখেননি তিনি। মনের অসীম প্রসার সেই উদাসী মুক্ত জীবনেরই ফসল। এইসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের সংস্কার ছাড়া আর কিছুই কাজ করেনি। তাঁর বিধিদত্ত আয়ত নয়ন দুটিই বলে দেয় যেন সমস্ত কিছুকে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে, বিরাট করে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারতেন, দেখতে ভালবাসতেন। আত্মার উপলব্ধি থেকে যে গান লেখা হয় এবং গাওয়া হয় তা তো একধরনের পূজাই—কখনও তা প্রেমের, কখনও ভক্তির, কখনও দেশমাতৃকার, কখনও বা প্রকৃতির। আন্তরিক আবেদনের কণামাত্র অসদ্ভাব এর কোনও অংশেই নেই।

নজরুলগীতির অসামান্যতা তাঁর সুরে নিশ্চয়ই। এত মর্মস্পর্শী হৃদয়গ্রাহী সুরের খেলা আর অন্য কোনও গানে সম্ভবত পাওয়া দুরূহ। নজরুলগীতি সঠিক গাইতে হলে গায়ক বা গায়িকার শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা জরুরি। সুরে মীড়ের কাজ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুড়কির তান, গজলভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীকে ছুঁয়ে যাবার সাবলীল চেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে। আবাল্য যে সুরপ্রীতি তাঁর ছিল তা-ই তাঁকে ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউল, ঝুমুর, কাজরী, চৈতি প্রভৃতি বিচিত্র সুরবাহারের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খানের কাছে মার্গসংগীতের কিছু শিক্ষা তিনি একসময় নিয়েছিলেন। কিন্তু সুরকে যেভাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা কেবলমাত্র তালিমেই সম্ভব নয় যদি নিজস্ব ভাবনার প্রয়োগ না ঘটে। সুর যেন নজরুলের আজ্ঞাবহ দাসের মতো আহ্বানমাত্রেই সাড়া দিয়েছে। কী বিচিত্র তার ব্যবহার, কী দরদী তার প্রয়োগ। অসামান্য সুরক্রীড়া হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে যে অনুরণন তোলে তার স্থায়িত্ব ও মর্মস্পর্শিতার তুলনা মেলা ভার। জানা যায় যে, অনেক সময় আগে সুর ঠিক করে পরে তাতে বাণী বসিয়েছেন কবি। আবার অন্যের লেখা কবিতায় তাৎক্ষণিক সুরের আরোপ করেছেন অবলীলায়। কখনওবা নিজের লেখা কবিতায় অন্যকেও সুর বসাতে বলেছেন। যা-ই তিনি করে থাকুন, একথা ঠিক যে, তাঁর গানের বাণী সুরের সুধায় সিক্ত হয়ে শ্রোতার অন্তরকে

নিঃসীম সুরসাগরে নিমজ্জিত করে। যত বিচিত্র শ্রেণীর গান, তত বিচিত্র তার সুরারোপ। সংখ্যার দিক থেকে বেশ কয়েক হাজার গান লিখে সুর সংযোজন করলেও একটির সঙ্গে আর একটির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। শুনলে মনে হয়, নজরুলের অন্তরে যেন ছিল সুরের এক অফুরন্ত খনি। এর জন্য কোনও সাধ্যসাধনা করতে হয়নি, চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন হয়নি। সুরের ঝরনাতলায় শুধু তিনি নিজেই অবগাহন করেননি, শ্রোতাকেও করিয়েছেন। আর এই বিচিত্র সুরমায়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কোনও উন্নাসিকতা ছিল না; তিনি পথচারী, মাঝিমাল্লা, ভিখারি, রাখাল বালক, নর্তকীর গীত কোনও কিছুকেই অবজ্ঞা করেননি। তা ছাড়া, গ্রামোফোন কোম্পানিতে চাকরি করার সময় বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত রেকর্ড তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলিও তাঁর কাজে লেগেছে। আশ্চর্য দক্ষতায় দুই বিপরীত সুরকে তিনি একই গানে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও শব্দ ছিল না। সন্ধ্যার সুরের সঙ্গে ভৈরবীর মিলনে এক অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। খাম্বাজ, পরজ-বসন্ত, হাম্বীর, আহীর-ভৈরব, দরবারী কানাড়া, ভৈরবী, দেশীতোড়ী, মালগুঞ্জ, খাম্বাজ মিশ্র, হেমকল্যাণ, মিশ্র দেশ, যোগিয়া মিশ্র, কলাবতী, জয়জয়ন্তী, ধানী কার্ফা, পিলুমিশ্র প্রভৃতি প্রচলিত রাগরাগিণীর পাশেই আছে অরুণ-ভৈরব, লাচ্ছাশামা, দোলনচাঁপা, নীলাম্বরী, সৈন্ধবী, পাহাড়ী-কানাড়া, কর্ণাটকী-সামন্ত, মান্দ, কৌশিক, উদাসী-ভৈরব, সর্‌পর্‌দা, বসন্ত-মুখারী, মধুমাধবী সারং প্রভৃতি।

নজরুলের গান শোনামাত্রই অনেক ক্ষেত্রেই গীতিকারের নাম বলা যায়। এমনটা সম্ভব হয়েছে কিছু কিছু গীতিকার ও সুরকারের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুর চিনিয়ে দেয় রবীন্দ্রসংগীতকে। দ্বিজেন্দ্রলালের সুর দ্বিজেন্দ্রগীতিকে চিনিয়ে দেয় এবং তার গায়নভঙ্গিও। তেমনি নজরুলেরও সুর, গায়নভঙ্গি নজরুলের গানকে পরিচায়িত করে। গীতিকার যখন সুরকার হন তখন প্রত্যেক গীতিকারেরই সুরের ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য থাকে। নজরুলের গীতরচনায় রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিকতার স্পর্শ ততখানি নেই, একথা সত্য; তবে যে উদ্দীপনা উন্মাদনা এবং সুরের ঐন্দ্রজালিক ব্যবহার আছে তা-ই নজরুলের গানের মুখ্য পরিচিতি। খুব বড় মাপের গীতরচয়িতা এবং সুরকার না হলে এমনটি সম্ভব নয়। বাংলায় রাগপ্রধান গানের ব্যাপক প্রচলন তিনিই করেন। বৈচিত্র্যের সন্ধানী নজরুল তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতোই গানকেও কোনও সীমানায় বেঁধে রাখেননি। স্তর থেকে স্তরে নানা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নিজের পথটি তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন অবলীলায়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় জানতে পারি—"আমি আর নজরুল দুজনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তাঁর স্বরচিত গান শোনাতে বললেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল গাইলো, 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল' আর 'এই শিকল পরা ছল', রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বললেন, 'নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরন আছে।" আব্বাসউদ্দিন নজরুলকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ composer বা সুরকার বলে চিনেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন ঢাকায় নজরুলকে নিয়ে কি কাড়াকাড়ি, নজরুলের গানে শ্রোতার কি আত্মহারা ভাব।

এসব মন্তব্য থেকে অন্তত এটুকু কথা স্পষ্ট যে, নজরুলের গানে সুরে-ভাবে এমন এক মাদকতা এবং মানবিক আবেদন ছিল যা শ্রোতাকে মোহমুগ্ধ করে রাখত। এমন স্বতঃস্ফূর্ত রচনাক্ষমতা--গানের পিঠে গান লেখা, সুরের আন্দোলনে কথা সমাবেশও বিরল। গ্রামোফোন কোম্পানিতে হারমোনিয়ামটি সামনে রেখে বসে আছেন নজরুল বহুতর মানুষের বহুরকমের চাহিদা পূরণের জন্য। ডুবে গেছেন তিনি সুরসমুদ্রে, অতলস্পর্শী মনের গভীর গহন থেকে তুলে আনছেন গুনগুনিয়ে কখনও কীর্তন, কখনও ঠুংরি, কখনও শাক্তসংগীত, ভাটিয়ালি, কখনও মুর্শিদি বা স্বদেশী গান। এহেন প্রতিভা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভাকে! কোন্ দরদী অন্তর থেকে সুরের এই ঝরনাতলায় তাঁর অবস্থান তা বুঝতে হলেও তো দরদী মনই চাই। তাই নজরুলের গানের গায়নভঙ্গি দরদী না হলে গানের আবেদনও হয় ব্যর্থ—এ শুধু সুরসংযোজন নয়, সুরে অবগাহন।

'ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র' নজরুল তালে, রাগে, সুরে, বৈচিত্র্যে, ছন্দে যেন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকে উল্কার সঙ্গে উপমিত করা যায়।

নজরুলের গান : স্রষ্টা ও সৃষ্টি

নজরুল জন্মশতবর্ষে সারা দেশ জুড়ে নজরুলের প্রতি, তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হচ্ছে আমি নিজেকে তার সামিল করতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি।

আমার আলোচনার বিষয় নজরুলের গান— যেখানে একাধারে তিনি গীতরচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। বাংলা সঙ্গীত জগতে অবশ্য এমন উদাহরণ বিরল নয়—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবিগণ ও সাহিত্যকারেরাও এই ত্রিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাই বাংলা সঙ্গীত জগত এঁদের অবদানে সমৃদ্ধ।

নজরুল প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। তাঁর 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে প্রচুর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব গান কেবলমাত্র উপন্যাসের আবহ সৃষ্টির কারণেই ব্যবহৃত, এমনই নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রের ভাললাগা, মন্দলাগার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনি নিজের জীবনের আদর্শ মেনেছিলেন।

নজরুলের প্রথম গানের সংকলন 'বুলবুল'। প্রথমদিকের গানে অবশ্য উন্মাদনা অনেক বেশি, হয়ত ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনার প্রভাবেই। এ সময় গণসঙ্গীতজাতীয় রচনাই ছিল মুখ্য। এসব গানে রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রেরণা আছে। গানগুলিতে যে সুর আরোপিত হয়েছে তা কখনই নিছক সুরের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নয় বা নজরুলের সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় রেখে যাবার সূত্রেও নয়। যেমন—চরকার গান, শিকল-পড়ার গান, মুক্তবন্দী, মুক্তি সেবকের গান, বিজয় গান, অভয়মন্ত্র, বন্দীবন্দনা প্রভৃতি নামগুলি থেকেই বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে স্মরণে রেখেই এই জাতীয় গান রচনা করা হয়েছে। যখন আমরা এই ধরনের গান শুনি—

বল নাহি ভয় নাহি ভয়
বল মাভৈঃ মাভৈঃ সত্যের জয়।

অথবা,

কারার ঐ লৌহ-কপাট, ভেঙ্গে ফেল্ কর রে লোপাট্
রক্ত জমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীর, প্রাচীর ভেদি।

কিম্বা,

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

তখনই এই সমস্ত গানে শরীরের কোষে কোষে রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, শ্রোতার অন্তরের সুপ্ত স্বদেশপ্রেম যেন শব্দের ও সুরের অভিঘাতে জাগ্রত হয়ে ওঠে।

সঙ্গীতরচয়িতা হিসাবে এইসব গানের একটা ভিন্নতর মর্যাদা আছে। কিন্তু এ জাতীয়

গান ছাড়াও কত বিচিত্র ধরনের গান যে নজরুল রচনা করেছিলেন এবং সেসব গানের সুরলহরী, মাধুর্য, শব্দবিন্যাস শ্রোতার সমস্ত অনুভবের জগতকে আচ্ছন্ন করে রাখত কীভাবে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আত্মভোলা মানুষটি যখন যেখানে গেছেন, যখন যেখানে বসেছেন সেখানেই গান বেঁধেছেন, সঙ্গে যদি থাকত কয়েক পেয়ালা চা আর পানজরদা তাহলে তো কোন কথাই নেই। অনর্গল কথা বলে যাওয়ার মত অনর্গল গান রচনা—বিস্ময়ের বৈকি।

আব্দুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত অখণ্ড নজরুলগীতি গ্রন্থটিতে নজরুলের গানের সংখ্যা দেওয়া আছে ২৮৭২। এটি কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত সংখ্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৯৭২। অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা কঠিন যে, এত সংখ্যক গানের কোন্‌গুলি নজরুলের রচনা, কোনগুলিই বা নয়। সেকারণে নজরুলগীতির গবেষকদের কাছে আমাদের দাবি পেশ করলাম যে, যত শীঘ্র সম্ভব নজরুল—রচিত গান, নজরুল-সুরারোপিত গানের একটি প্রামাণ্য পরিসংখ্যান আমাদের পাওয়া প্রয়োজন।

যে কোন প্রকার সঙ্গীতেরই কথা ও সুর প্রধান আশ্রয়। তার মধ্যে আবার কোন সঙ্গীত বাণীপ্রধান, কোনটি বা সুরপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় স্পষ্টই বলেছেন যে, সঙ্গীত কেবলমাত্র কথার সমষ্টি নয় যতক্ষণ না তা কোন গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাব প্রকাশ করতে পারে ততক্ষণ তার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না। এই 'ভাব' কীভাবে তৈরী হয়? রবীন্দ্রনাথই বলেছেন,—"সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়ে আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।" তবে ভাবের ব্যাপারটি কবিতার ক্ষেত্রে যত বিশদভাবে প্রযোজ্য, গানের ব্যাপারে তত নয় আর সেকারণেই তেমন সমুন্নত ভাবের সঙ্গীত না হলেও কেবলমাত্র সুরের আকর্ষণেই শ্রোতার অনুভবতন্ত্রীতে গান অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে। এই কথা ও সুরের মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উভয়েরই প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন—"কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। ......কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে।" যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে কোন গান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। নজরুল গানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "গানের কথার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভাবি গানের সুরের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি।" অনেক সময় সঙ্গীতমুগ্ধ শ্রোতা কি কারণে একটি গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন না। নজরুলের ক্ষেত্রে কোন কোন সঙ্গীতে অবশ্যই কথার গুরুত্ব আছে, যেমন স্বাদেশিকতার গানগুলি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কথার চেয়ে সুর একটা ইন্দ্রজাল বিস্তার করে রাখে—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ যে সব গানে অতীন্দ্রিয় মোহজাল বিস্তার করে রাখে তাদের আবেদন বহুকালস্থায়ী।

"মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা"—এই গানের কথায় বেদনার্ত চিত্তের যে আর্তি ঝরে পড়ে তা সর্বকালের সকল মানবের চিত্তলোক স্পর্শ করে নিঃসন্দেহে আর

তারই সঙ্গে করুণ-মধুর সুরের ওঠানামা, ক্রন্দনপরায়ণ চিত্তের আবেগ-বিহ্বলতায় শ্রোতার চিত্তও ব্যথিত হয়ে ওঠে। "ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি"—পূরবী রাগিণীর এই গানটি যেমন কথা তেমনি সুরে শ্রোতাকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। এসব ক্ষেত্রে অনুভূতিপ্রবণ মনটুকুই জরুরী, শ্রোতার শিক্ষার প্রয়োজন তত বেশি নয়। নজরুলের গানের মানবিক আবেদন এত বেশী যে, অনায়াসে তা শ্রোতার চিত্তকে ছুঁয়ে যায়। নজরুলের গানের গলা তেমন ভাল না থাকা সত্ত্বেও তাঁরই কণ্ঠে তাঁরই গান শোনার জন্য মানুষ ছিল পাগল—এসব কথা আমরা একাধিক লেখকের লেখায় পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা যমুনা সংগম।" একথা নজরুলের গান সম্পর্কে শতকরা একশ ভাগ সত্য। অসম্ভব আবেগতপ্ত কবিচিত্ত যেন প্রতিনিয়তই দুকূল ছাপিয়ে ভেসে গিয়েছে সৃষ্টির জগতে—কত বিচিত্র গান, কত বিচিত্র সুর, কতই না ছন্দ, কত না বাক্‌প্রতিমা; চব্বিশ বছরের সৃজনশীলতায় বাংলার প্রতিটি মানুষের অন্তরকে নাড়া দিয়ে গিয়েছেন কবি-গীতিকার।

নজরুলের গানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—কাব্যগীতি ও ভক্তিগীতি। যে কোন গানই হোক-না-কেন অন্তরের উষ্ণতায় তা ভরপুর। অন্তরের এতখানি উষ্ণতা থাকতে পারে সেখানেই যেখানে ভালবাসার অভাব নেই। বাংলাদেশ, তার প্রকৃতি, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সর্বত্রই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সুন্দরকে। "আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে,/ সুন্দর যা'রা, তাদের দেখিতে।"-এই-ই তো নজরল মানসের সত্যভাষণ। এই সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতি দেবতা ও মানবে কোন ভেদ নেই। সুন্দরের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভ করা যায় তা নজরুলের সহজ বিশ্বাসের মধ্যেই ছিল। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভের জন্যই নজরুলের সৌন্দর্য-দর্শন নয়, মন যার সুন্দরের স্পর্শে ধন্য তিনি তাকে অস্বীকার করবেন কেমন করে? এহেন নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখতে পারলেই ত মানবজীবনের সার্থকতা। নজরুলের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করে দেখলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় যে, কেমন করে এত দুঃখ যন্ত্রণা বিপর্যয়ের পরেও সুন্দরের জন্য কবির এত স্পর্শকাতরতা থাকে! এইখানেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাধর্ম লক্ষ করা যায়।

নজরুলের কাব্যগীতির মধ্যে প্রেমের গানগুলি অন্যতম। গানগুলিতে প্রেমের অনুভব, সুরের রোমান্টিকতা, শব্দের মধুর বিন্যাস চোখে পড়ে—

"আমায় নহে গো, ভালবাস শুধু, ভালবাস মোর গান"

কিম্বা

"আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে"—

এসব গানে শব্দ বিন্যাসে মাধুর্য, সরলতা আছে, বিন্দুমাত্র কাঠিন্য নেই। আর সেকারণেই গানগুলি চিত্তকে স্পর্শ করে দ্রুত, ছাপ ফেলে যায় অতি সহজে। প্রেমের এই ভাবটি বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে। কবি যখন লেখেন "রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম ঝরে শাওনধারা। গৃহ-

কোণে একা আমি ঘুমহারা" তখন বোঝা যায়, প্রেমিক হৃদয়ের নিঃসঙ্গতার বেদনাকে কবি যেন আপন চিত্ত দিয়ে অনুভব করেন। নজরুলের একটি গানে কদম তমাল ডালে নটশ্যামের দোলনা দুলছে দেখে পুরনারী অধীর হয়ে উঠেছেন প্রেমিকের কাছে পৌঁছবার জন্য, অথচ ঘন ঘন অশনি আঘাত এবং গুরুজনের তর্জনী তাকে গৃহত্যাগে নিবৃত্ত করছে বলে প্রেমিকের ব্যাকুলতা হয়েছে সীমাতিশায়ী—

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে/ কাজরী নাচিয়া চল পুরনারী হরষে।
কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে-/ কুহু পাপিয়া ময়ূর বোলে।

... ...

ডাকিছে ঘরছাড়া ঝড়ের বাঁশি/অশনি আঘাত হানে দুয়ারে আসি',
গরজাক গুরুজন ভবনবাসী/আমরা বাহিরে যাব ঘনশ্যাম দরশে।।

এইসব গানেরই যেন অনুরণন শোনা যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই।।

অথবা

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

প্রেমের গানের মধ্যে রাগভিত্তিক গান, লোকগীতি, গজল ইত্যাদি সবই অন্তর্ভূক্ত। এমনকি ভক্তিগীতিকেও এই পর্যায়ের মধ্যে ফেললে খুব ভুল হয় না। ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম নির্ভরতা, ভালবাসা থেকেই এই জাতীয় গানের উৎসার। এই ঈশ্বর হিন্দু অথবা মুসলমানের নয়, মানুষের। হিন্দুর দেব্-দেবী এবং ইসলামের আল্লা তাঁর গানে মিলেমিশে একাকার। আর তাই তিনি বলতে পারেন—

আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ্, যাঁহার তারিফ জগৎময়।।
আমার কিসের শঙ্কা?
কোর্‌আন্ আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।।

ঠিক এই একইভাবে তিনি বলেন—

মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।।

মানুষকে ভালবেসেই এমন কথা বলা সম্ভব। ভালোবাসা বা প্রেম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করে না, নজরুলও তেমনি একই লেখনীতে শ্যামা মায়ের কথাও লেখেন আবার রাধার

বিরহকে অবলম্বন করে কীর্তনও রচনা করেন—

(ক) শ্মশান ভালবাসিস বলে....

(খ) আমিই না হয় মান করেছিনু....

বস্তুত আল্লা অথবা কৃষ্ণ যা-ই বলি-না-কেন, কবির মনের মধ্যে বিশ্বসৃজনকারী শক্তির যে অনুভব আছে তা তো জাতিভেদ জনিত বিতর্কের বহু উর্ধ্বে। নজরুল তাঁর মনের প্রকৃত ভাবনার কথা এভাবেই জানিয়েছেন—

কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান
সে যে রে তোর মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ সে তোর মাঝে রয়।

... ...

প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশ্‌তে, স্বর্গে—কোথাও নয়।।
এই তোর মন্দির, মসজিদ
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল
কোথা তুই তীর্থে যাবি মন
এই তোর মক্কা-মদিনা;
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।।

প্রকৃতপক্ষে কোন বন্ধনেই বেঁধে রাখেন নি কবি নিজেকে। তাঁর ভবঘুরে জীবনে মনের যে অসীম প্রসার ঘটেছিল সেও সেই উদাসী মুক্ত জীবনেরই ফল। বিধিদত্ত বিশালায়তন চক্ষু দুটিই যেন বলে দেয় যে, সব কিছুকেই তিনি মোহমুক্ত, প্রসারিত ও উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারতেন এবং দেখতে ভালবাসতেন। আত্মার উপলব্ধি থেকে যে গানের জন্ম তা তো একপ্রকার পূজাই—তা সে প্রেমিকের কাছেই হোক বা দেশের কাছে কিম্বা প্রকৃতির কাছে।

নজরুলগীতির আবেদন তার সুরের কাছে বহুলাংশে। কথা সেখানে উপেক্ষিত নয়, কিন্তু সুরে সূক্ষ্ম মীড়ের কাজ, মুড়কির তান, গজলের ভঙ্গি গানগুলির আবেদনকে অসামান্যতায় পৌঁছে দেয়। কত বিচিত্র সুরের খেলা—ভাটিয়ালী, বাউল, ঝুমুর, কাজরী, ভাওয়াইয়া, সাঁওতালী, ভজন, রামপ্রসাদী প্রভৃতি। একসময় ওস্তাদ জামীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে মার্গসঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন নজরুল। কিন্তু সুরকে যেভাবে তিনি নিজের আজ্ঞাবহ করে রেখেছিলেন তা কেবলমাত্র তালিমেই সম্ভব নয়। অনেক সময় গান রচনার আগেই সুর ঠিক করেছেন আর তারই ভাঁজে ভাঁজে পরে বসিয়েছেন গানের কথা। আবার ঝরণা যেমন আপন খুশিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝরে পড়ে, নজরুলের কণ্ঠে সুর তেমনি ঝরে পড়েছে অকাতরে। মাঝিমাল্লা, পথচারী, ভিখারী, নর্তকী—কাউকেই তিনি অবজ্ঞা করেন নি। সুর শুধু কানে এলেই তাকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেছেন নজরুল। যে সব রাগরাগিণীর ব্যবহার নজরুলের গানে আছে সেগুলি হল দেশ, কলাবতী, দরবারী কানাড়া, আহীর-

ভৈরব, হাম্বীর, পরজ-বসন্ত, খাম্বাজ, দেশীতোড়ী, মালগুঞ্জ, জয়জয়ন্তী, ভৈরবী, মিশ্রদেশ, যোগিয়া মিশ্র, পিলু মিশ্র প্রভৃতি এবং এরই পাশাপাশি আছে অরুণ-ভৈরব, দোলনচাঁপা, নীলাম্বরী, সৈন্ধবী, পাহাড়ী-কানাড়া, কৌশিক, উদাসী-ভৈরব, বসন্ত-মুখারী, মধুমাধবী প্রভৃতি। কখন মৌলিক রাগরাগিণীর ব্যবহার, কখনও দুই রাগরাগিণীর মিশ্রণে ভিন্ন রাগের উৎপত্তি। আসলে নজরুলের গানের অস্বাভাবিক চাহিদা তাঁকে বিচিত্র সুরে গান রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেদিক থেকে নজরুলকে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্পোজার হিসাবে উল্লেখ করা চলে। আর এই কারণেই নজরুলের গান গাইতে হলে পরিশীলিত কণ্ঠ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে জ্ঞান থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়, নচেৎ গান হয়ত গাওয়া যায়, কিন্তু শ্রোতার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছন যায় না।

নজরুলের গানে হিন্দু বা ইসলামী পুরাণের প্রয়োগ নানা জায়গায় আছে। মিথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয় সংস্কৃতিকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। ইসলামী-গানে সেই পুরাণের প্রসঙ্গ বা কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীতে তদ্বিষয়ক পুরাণ প্রসঙ্গ তো থাকতেই পারে। কিন্তু যেখানে একই গানের মধ্যে দুইজাতীয় পুরাণ-প্রসঙ্গই আনেন সেখানটিই লক্ষ করার মত—

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।

....

ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয় রাগে নয়রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।

একদিকে বলেন " আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দুর্বাদলশ্যাম", আর একদিকে বলেন "ও ভাই আমরা শহিদ মাঠের মককায় কোরবানি দিই জান..."।

নজরুলের গানে শব্দ প্রয়োগে কোন বাছবিচার নেই। ভাব প্রকাশই যেখানে মুখ্য সেখানে যে-কোন ধরনের শব্দের ব্যবহারই স্বাগত। যেমন—

আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফ্যঁস গয়ি;
বিনোদ-বেণীর জরীন্ ফিতায়
অন্ধা এশক মেরা ফঁস গয়ি।।

বাংলার পাশে আরবী-পারসী শব্দ, তারপরেই আবার বাংলা শব্দ—এ নিয়ে নজরুলের কোন সঙ্কোচ ছিল না। বাংলা গজল গান লিখেছেন বলে বাংলা শব্দ ছাড়া অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করা যাবে না—এমন ছুঁৎমার্গ নজরুলের ছিল না। তাই শব্দে-সুরে-তালে-ছন্দে নজরুলের এই জাতীয় গানগুলি অসামান্য হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বিজাতীয় শব্দ ব্যবহারকে সন্দেহের চোখে বা অপ্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। মানুষ আজ সমগ্র বিশ্বকে নিজের আত্মীয় করে নিয়েছে আর নজরুল তা করেছিলেন আজ থেকে কতকাল আগে। অনেক সময় তিনি অতি সাধারণ তুচ্ছ শব্দও গানে ব্যবহার করেছেন। যেমন—"ভূমিকম্পের প্রলয়লীলায় সব হ'ল ছারখার/ভিক্ষার

ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর।।"—এই 'ছারখার' শব্দ সচরাচর গানে ব্যবহারের জন্য নয়। কিন্তু এই শব্দটির সাহায্যে সর্বহারা মানুষের সর্বরিক্ততার যে প্রকাশ ঘটানো গেছে তা কোন মার্জিত শব্দ ব্যবহারে হয়ত সম্ভব হ'ত না। আবার শুধু শব্দ ব্যবহারই নয়, তাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতা আছে—র্গা র্রা র্গা র্মা র্রা র্সা — তার সপ্তকের এই স্বর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে হাহাকার যেন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসব গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হলে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। প্রায় প্রত্যেকটি শব্দে স্বতন্ত্র ঘা মেরে উচ্চারণ করার ফলে পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা, ধ্বংসের ভয়াবহতা যেন অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। নিচের গানটিতে—

কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙ্গে ফেল্, কর রে লোপাট্
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।

এখানে লৌহ-কপাট্, লোপাট্, জমাট্ ইত্যাদি শব্দে ধাককা মেরে উচ্চারণ করার ফলে গানে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি আসে। অবশ্য শুধু শব্দের ব্যবহারেই নয়; উদ্দীপনা, দৃপ্ততার জন্য সুরের অবদান এখানে বিন্দুমাত্র কম নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-"সঙ্গীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। ভাবের সঙ্গে সুরের মিশ্রণেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।"

নজরুলের যে-কোন গানই, বিশেষতঃ গজল্জাতীয় গান কোনভাবেই শুধু কবিতা হিসাবে সার্থকতা পায় না যতক্ষণ না তার দেহে সুরের অনুলেপন ঘটে।

কবির কোন খণ্ডিত দেশকাল থাকে না। আর তাই কবি নজরুলকেও হিন্দু কিম্বা অহিন্দু কবি—এভাবে বিভাজন করা যায় না। তিনি মানুষের জন্য তাঁর কবিতা লিখেছেন, রসগ্রাহী শ্রোতার জন্য গান লিখেছেন। সেখানে কোন দেশভেদের ব্যাপার বড় হয়ে উঠতেই পারে না। নজরুল চেয়েছিলেন মৈত্রীর বন্ধন, মানুষে মানুষে মিলন, ঐক্য, সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত এক শুদ্ধ জীবনই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। গানেও তিনি সেই ইচ্ছাপূরণের চেষ্টাই করেছেন। নিজের গান সম্পর্কে নজরুল ছিলেন অসম্ভব স্পর্শকাতর। বড় ব্যাকুল হয়ে তাই তিনি বলেছিলেন— "আপনারা আমার কবিতা সম্পর্কে যা ইচ্ছা হয় বলুন, কিন্তু গান সম্পর্কে নয়। গান আমার আত্মার উপলব্ধি।" বস্তুতপক্ষে নজরুলের বহু গানের ইতিহাসে ব্যক্তিজীবনের অনেক বেদনা, অনেক কারুণ্য গুপ্ত হয়ে আছে। বড় বেদনার সেই জায়গায় কোনরকম হস্তস্পর্শ একেবারেই অসহনীয়।

নজরুলের প্রতিভা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মধুসূদনকে। কোন্ দরদী অন্তরের এহেন প্রকাশব্যাকুলতা তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলেও তো দরদী মনটিই চাই। তাই নজরুলের গানে ও সুরে অবগাহন না করতে পারলে তার আবেদন সৃষ্টি করা যায় না। এ শুধু গান গাওয়া নয়, কথায় ও সুরে মগ্নতা। 'ছন্দ সরস্বতীর বরপুত্র' নজরুল সুরে, ছন্দে, রাগরাগিণীতে, বৈচিত্র্যে যেন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মগ্ন হয়েছিলেন।

সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ—এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। ...উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, শব্দ ও স্বরবৈচিত্র্যের অঙ্গাঙ্গী মিলনেই উৎকৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের মত উৎকৃষ্ট সঙ্গীত জন্মলাভ করে।

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language -এ 'Music' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"an art of sound in time which expresses ideas and emotions in significant forms through the elements of rhythm, melody, harmony and color."

এখানেও 'ধ্বনির' প্রসঙ্গ আছে এবং সে ধ্বনি অবশ্যই শব্দজাত। তারই সঙ্গে ছন্দ, সুস্বর, সুরের সঙ্গতি এবং বর্ণের সংমিশ্রণেই সঙ্গীতের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের কথায় "গান শুধু সুর নয়, সুরের সঙ্গে কথার মিলনেই তার পূর্ণতা; বিচ্ছেদে নয়।"

এসব মন্তব্যে বাণী ও সুরের বিশেষ সম্পর্কের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তবে যন্ত্রসঙ্গীত অনেক পরিমাণে উক্ত বিশেষত্ব হতে স্বতন্ত্র, সেখানে বাণী নয়, সুরেরই প্রাধান্য। তবে কোন গানকে যখন সুরে ধরার চেষ্টা যন্ত্রসঙ্গীতে হয় তখন বাদক ও শ্রোতা সুর অনুযায়ী গানের বাণীগুলি মনে মনে উচ্চারণ করে থাকেন প্রকাশ্যে ব্যক্ত না হলেও।

অতএব যে-কোন সঙ্গীতেরই মুখ্য আশ্রয়—কথা ও সুর। প্রসঙ্গতঃ বাণীপ্রধান সঙ্গীত এবং সুরপ্রধান সঙ্গীতের বিষয়টিও স্মরণে রাখা যেতে পারে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মূলতঃ সুরের মাধ্যমে রাগ-রাগিনীর বিস্তারই মুখ্য—কথা সেখানে গৌণ ভূমিকায় থাকে। অন্যান্য গানে বাণী বিশেষ প্রাধান্য পায়। সাধারণপক্ষে ব'ণীকে অধিকতর গুরুত্বদানের একটা প্রবণতা থাকেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাণীর যে সৌন্দর্য ও গভীরতা তা শ্রোতার মনকে এক বিশেষ সৌন্দর্যলোকে বা উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেয় নিশ্চিতভাবেই। সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাণীর স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি কেবলমাত্র তা-ই সত্য হত তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত না গেয়ে কেবলমাত্র রবীন্দ্রকবিতার পাঠ বা আবৃত্তি করেই আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ঘটানো যেতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রকবিতার পাঠ বা আবৃত্তি শোনার পরও রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার বাসনা থেকে যায়। সেইসব কবিতার মধ্যে গীতিপ্রাণতা থাকে বলেই গান না হওয়া পর্যন্ত তার চূড়ান্ত পরিণতি নেই। আর গীতিপ্রবণতা থাকলেই সুরের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীমুখ্য হলেও সেকারণে সুরের গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই কোনভাবেই। 'সংগীত ও কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী।...কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।"

এই ভাবের ভাষাটি তাহ'লে কথা ও সুরের মিলনেই গড়ে ওঠে। বাণীপ্রধান গানও ভাবপ্রাধান্যকে বর্জন করে নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেছেন যে, কবিতা ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে যতখানি উন্নতি লাভ করেছে, সংগীত ততখানি উন্নতি লাভ করেনি। এই অভিমতটির সার্থকতা বোঝা যায় তখনই যখন দেখি কোন গীতিকবিতায় ভাবের তেমন গভীরতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু সুরের আকর্ষণে তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। এসব ক্ষেত্রে গানের বাণীর চেয়ে সুরের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অধিক। উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্য কথা ও সুরের যে সমান গুরুত্ব থাকা উচিত তা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়—

"কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে।....ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে।....যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে।"

অতএব উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে বাণী ও সুরের তুল্যমূল্য অবস্থান। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে নজরুলের গানকে বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। নজরুল নিজেও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই বলেছিলেন—"গানের কথার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভাবি গানের সুরের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি।" প্রকৃতপক্ষে গানের কথা বা বাণীকে সুর নানা বৈচিত্র্যে অনেক বেশি অর্থবহ করে তোলে। একই কথা নিম্নস্বরে বললে যে অর্থ বোঝায়, উচ্চৈঃস্বরে বললে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাতে পারে সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন। যিনি সাধারণ শ্রোতা, যাঁর সুরজ্ঞান তত সমৃদ্ধ নয় তিনি গানের কথাকেই মুখ্য মনে করেন; যিনি সুরচর্চায় পারদর্শী তিনি সুরের কারিগরিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু সঙ্গীতের যিনি সঠিক বোদ্ধা তিনি জানেন যে, একটি গানের সাফল্য নির্ভর করে তার বাণী, সুর এবং সর্বোপরি গায়কের গায়নভঙ্গির ওপর। নজরুলগীতিতে বাণী ও সুরের সহাবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে। যেমন—

মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে/ তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা।।

এখানে 'মনে পড়ে' শব্দ দুটির পর কিছুটা টান আছে, কিছুটা থেমে থাকা—যেন কোন্ সুদূর অতীত স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কিছু অনুসন্ধান করে নিয়ে আসার চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার তীব্রতা বোঝাতে তারসপ্তকের র্সা-তে সুরের কিঞ্চিৎ অবস্থান। আবার সুরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শও আছে গজল বা রাগপ্রধান গানগুলিতে। যেমন—

এল ওই বনান্তে পাগল বসন্ত।
বনে বনে মনে মনে রং সে ছড়ায় রে/চঞ্চল তরুণ দুরন্ত।।

এখানে বসন্তকালীন রঙিন পরিবেশটি পরজ-বসন্তের সুরে যেন এক ইন্দ্রজাল তৈরি করে। বাঁশির ব্যাকুল বসন্তের সুরে সমস্ত মন-প্রাণ যেন বুঁদ হয়ে যায়। আবার সুরের অতিরিক্ত জাঁকজমক বা চটুল ব্যবহারও যে নেই তা নয়, হাসির গানগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নজরুলের গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা হয়ত নেই, বরং মানবিক ভাব ও ভাবনায়, চাওয়া ও পাওয়ায়, প্রাণের উত্তাপে তা তাপিত। নজরুল যখন গেয়ে ওঠেন—"মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী দেব খোঁপায় তারার ফুল" তখন প্রেমিকের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সঙ্গীত হিসাবে এই গানে কোন অধ্যাত্মভাবনা বা অপ্রাকৃত প্রেমের অনুসন্ধান করা বৃথা, কিন্তু গানটির প্রতিটি শব্দে প্রিয়াকে সজ্জিত করার জন্য প্রিয়ের যে দরদ ও ব্যাকুলতা তা সুরের ব্যবহারের মধ্যে ঝরে পড়ে। "মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা/আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে/তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা।।"—গানটি কি প্রতিটি শ্রোতার অন্তরকে বেদনার্ত করে তোলে না? সে কোন্ উপায়ে? অবশ্যই বাণীর যে মর্মস্পর্শিতা এবং তারই সঙ্গে সুরের যে দরদী প্রয়োগ— তাই দিয়েই ত? আবার দেখি—

ভেসে আসে সুদুর স্মৃতির সুরভি/হায় সন্ধ্যায়।
রহি রহি কাঁদি ওঠে সকরুণ পূরবী/ আমারে কাঁদায়।।

এই গানটিরই সঞ্চারী অংশ—

কেহ গেল দলি, কেহ ছ'লি, কেহ গলিয়া/নয়ন-নীরে;
যে গেল সে জনমের মত গেল চলিয়া/এল না ফিরে।

—এখানে সুরের যে নিম্নাভিমুখিতা তা শোকার্ত চিত্তের শিথিল প্রকাশের পক্ষে একান্ত উপযোগী, থেমে থেমে সুরের প্রয়োগ, ধীর লয়ে গাওয়া—সবটুকু মিলেই কিন্তু বাণীকে অধিকতর গভীর অর্থবহ, হৃদয়স্পর্শী ও দরদী করে তোলে।

আবার কাহারবা-তে "রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্/খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়?/ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে/কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়।।"—গানখানিতে যেন নূপুরের ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়। এখানে গানের বাণী এক অসামান্য চিত্রকল্প তৈরি করে—নূপুরের রুম্ ঝুম্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে একটি মেয়ের ওড়না দুলে দুলে ওড়ে, পথের বালুকায় অজস্র ফুল ছড়িয়ে পড়ে, নূপুর পরা মেয়েটির বাঁকা ভ্রূ-র ধনুক, পাথরকুচির হার, গোলাপ গালের লাল যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে। এমন রূপবতী একটি মেয়ের রূপতৃষ্ণায় কত যে রূপভিক্ষু মুসাফির পথ হারালো তার হিসেব নেই। এসব গানে নজরুলের স্বতঃস্ফূর্ততার কোন অভাব নেই। অজস্র গানের রচয়িতা যেন খেলার ছলে গীতিকবিতাগুলিতে সুরারোপ করেছেন। সুরবর্জিত কবিতা বা সুর আরোপিত গান—যাই হোক-না-কেন, যেন প্রকাশ ইচ্ছার প্রবল জোয়ারে তাদের আবির্ভাব।

নজরুলের গানে সুর ও বাণীর পারস্পরিক সম্পর্কটি কেবলমাত্র একই জাতের শব্দ ব্যবহারেই নয়, ভিন্নজাতীয় শব্দ ব্যবহারেও চমৎকার ফুটে ওঠে—

আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফঁ্যাস গয়ি;
বিনোদ-বেণীর জরীন্‌ ফিতায়
অন্ধা এশ্‌ক্‌ মেরা ফঁ্যাস গয়ি।।

—এই গানে বাংলা শব্দের পাশেই উর্দু শব্দ আবার তারপরেই বাংলা শব্দের সহাবস্থান—গানের বাণীতে এই বিচিত্র শব্দ ব্যবহার কি কোন অসামঞ্জস্য তৈরি করেছে? বরং এ যেন গজল গানের পরিবেশটিকে অনেকখানি তুলে ধরেছে— ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও যেন মনে হয়—"আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন", "চিত্ত যেথায় হারিয়ে গেছে'—এই ধরনের জোলো বাণীর পরিবর্তে 'দিল ওহি মেরা ফঁ্যাস গয়ি"— অনেক সুপ্রযুক্ত। তাছাড়া, শব্দ ব্যবহারে কোন ছুঁৎমার্গ ছিল না নজরুলের। নিজের আবেগকে প্রকাশ করতে গিয়ে যখন যে শব্দের প্রয়োজন হয়েছে তাকেই এনে বসিয়েছেন গানের পঙ্‌ক্তিতে। এক্ষেত্রে শুধু দেখা দরকার যে, বিভিন্ন জাতের যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা গীতের মাধুরীকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে কিনা? আজকের দিনে আমরা জানি ভাবপ্রকাশের ভাষা সব দেশেই মানুষের এক এবং প্রয়োজনে বিজাতীয় শব্দ ব্যবহারকে আজ আর কোন সন্দেহের চোখে দেখা হয় না। নজরুলের কাছে গানের ভাব বা আবেগটিই ছিল মুখ্য, তার জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহারে, যদি ঔচিত্য খণ্ডিত না হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত।

নজরুলের প্রেমের গানগুলির আকর্ষণ অসামান্য। এই আকর্ষণ বা আকুতি কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? নিশ্চয়ই শুধু বাণী অথবা শুধুই সুর দিয়ে নয়। "তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?/চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে নাত' কিছু চাঁদ।/... হেরিতে তোমার রূপমনোহর/ পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর,/মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ।।"—সুন্দরকে দেখার এই যে বাসনা সেখানে কবির যে আকুলতা—"একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী" অথবা "আমার মা যে গোপাল সুন্দরী" ইত্যাদি গানে সুন্দরের স্পর্শ পাবার মধ্যে যথার্থই কি কোন প্রভেদ আছে? 'সুন্দর' এখানে নানারূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে আর সেখানেই নির্দ্বিধায় কবি বলেছেন—

আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে,
সুন্দর যা'রা, তাদের দেখিতে।

এই 'সুন্দর'কে দেখা বা প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকেই যে সকল শব্দের আশ্রয় নিতে হয় কবিকে সেগুলি কবির সৌন্দর্যবোধকেই স্পষ্ট করে তোলে। সেই সৌন্দর্যের রাজ্যে দেশ, নারী ও প্রকৃতিতে কোনই ভেদ রাখেন নি কবি। হতে পারে, এই সৌন্দর্যভাবনার সঙ্গে অনেকখানিই প্রাকৃতভাবনা জড়িয়ে আছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় চেতনায় পৌঁছনর প্রথম সোপান হিসাবে এই প্রাকৃতচেতনাকে গ্রহণ করতে তো কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। যে কোন প্রেমের গানেই কতগুলি অতি সাধারণ শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই কবিচিত্তের আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা ঝরে পড়ে—

(ক) আমায় নহে গো, ভালবাস শুধু, ভালবাস মোর গান।
(খ) এত কথা কিগো কহিতে জানে,
চঞ্চল ঐ আঁখি।
নীরব ভাষায় কি যে ক'য়ে যায়
মনের বনের পাখী।।

প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে, গ্রীষ্মের দাবদাহ বর্ণনায়— 'মেঘবিহীন খরবৈশাখে' গানটিতে "সমাধি-মগ্না উমা তপতী রৌদ্র যেন তার তেজোজ্যোতি, ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্ত কপোতী কপোত পাখায় শুষ্ক শাখে"—অথবা শীর্ণা তটিনী, দগ্ধ ধরণী, নির্জলা একাদশীর তিথি, পিপাসিত আকাশ, মেঘ-ডমরু, দামিনী, মেঘ-কুঞ্জর-সেনা, বিজলী-জরিণ ফিতা, ভাদরতটিনী, জলদ-মৃদঙ্গ, বরষা-বেদিনী, ঝঞ্ঝার ঝল্লরী প্রভৃতি শব্দ ভরা বর্ষার মেঘমন্দ্র-রূপটিকে স্পষ্ট করে তোলে। সেখানে বর্ষাঋতুর নানা রাগ-রাগিণীর সঙ্গে এই সমস্ত শব্দের হরগৌরী মিলনে সঙ্গীত চরম সার্থকতায় পৌঁছে যায়। যেমন—

অঝোর ধারায় বরষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।
নিদ্রা নাহি তোমায় চাহি' আমার নয়ন পাতে।।

প্রভৃতি বাণী বর্ষার মেঘমন্দ্র রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এখানে বর্ষাঋতুর অঝোর ধারার সঙ্গে অনন্ত প্রেমের ব্যাকুল মিলনাকাঙ্খা যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে।

আবার দেখা যাক্ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গানে—

ভূমিকম্পের প্রলয়লীলায় সব হ'ল ছারখার
ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর।।

এখানে ভূমিকম্পের প্রলয়লীলার বর্ণনায় নিতান্ত সাধারণ অথচ বলিষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যেমন 'ছারখার' শব্দটি। এখানে সুরও তার সপ্তকের। অর্থাৎ সমস্ত ছারখার বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য যে বুকফাটা হাহাকার তাকেই যেন তারার 'র্গা র্রা র্গা র্মা র্রা র্রা র্সা' ইত্যাদি স্বরবিন্যাসে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি করেই 'বিত্তবিহীন চিত্ত ভরিয়া' অংশটিও তার সপ্তকের সুরে গাওয়া হয় অর্থাৎ বিত্তহীনতার যন্ত্রণাকে দিক্‌বিদিকে খান্ খান্ করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যেন। সমবেত কণ্ঠে এই গান গাওয়া হলে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। প্রতিটি শব্দে জোরালো ঘা দেওয়ায় একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশও সৃষ্টি হয়। গানটিতে পরিস্থিতির ভয়াবহতা, ধ্বংসের অসহায়তা, জনমানসে সচেতনতা সৃষ্টির যে ছবি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে উদাত্তকণ্ঠের ভারি সুরের ব্যবহার গানটিকে অবশ্যই ভিন্নমাত্রা দেয় যার ফলে শ্রোতার কাছে এক সার্থক ফলশ্রুতি তৈরি হয়।

'কারার ঐ লৌহ-কপাট্, ভেঙে ফেল কর্‌রে লোপাট্
রক্তজমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয়বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীর, প্রাচীর ভেদি।

—গানটিতে লৌহ-কপাট্, কর্‌রে লোপাট্, রক্ত-জমাট প্রভৃতি শব্দে ঘা দিয়ে উচ্চারণ করার ফলে গানে একটা দৃপ্তভঙ্গি আসে। সমস্ত গানটি জুড়েই ওই ধরণের শব্দ-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে—

মার্ হাঁক হৈদরী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্ মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে।

—এই উদ্দীপনা, দৃপ্ততা শুধু শব্দব্যবহারেই নয়, তদনুযায়ী সুরের ব্যবহারেও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আবার এরই চূড়ান্ত সার্থকতা পেতে গেলে উপযুক্ত গায়নভঙ্গির আশ্রয় নিতে হবে অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— "সঙ্গীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। ভাবের সঙ্গে সুরের মিশ্রণেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।"

শুধুমাত্র একটি উৎকৃষ্ট কবিতা তার অন্তর্নিহিত অর্থের দ্বারা শ্রোতার বা পাঠকের অন্তরদেশকে স্পর্শ করে যায়, কবির ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ আমাদের এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে নিয়ে যেতে পারে যখন তার গায়ে সুরের অনুলেপন আঁকে আর তাতেই ভাব চরমোৎকর্ষ লাভ করে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথা ও সুর' গ্রন্থে বলেছেন, "গানে কথা অর্থাৎ কবিতা চাই। সেই কবিতার ভাবার্থ নিয়ে সুর বসাতে হবে। ...সুরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে তোলা।...কবিতা মনের এক স্তরের এক ধরনের ভাব-সমাবেশের ভাষা, সুর অন্য স্তরের। প্রকাশ করবার প্রবৃত্তির ভিত্তি ছাড়া এ দুই ভাষার কোন প্রাথমিক সম্পর্ক নেই। ...সুর ও কবিতা হরগৌরীর মতন অঙ্গাঙ্গীভাবেই মিলিত হয়েছে, সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটি না-কেবল সুরের, না-কেবল কবিতার, অথচ দুইয়ের মিলনে একটি অতিরিক্ত ফল। তার ভিন্ন নাম দেওয়াই ভালো— সঙ্গীত।"

এই কথাগুলিকেই আমরা নজরুলের বিভিন্ন ধরনের গানের বাণীরচনার ক্ষেত্রে স্মরণ করি। অনেক সময় এই জাতীয় দেশাত্মবোধক কবিতায় বাণীর প্রাধান্য অস্বীকার করার নয়, তার একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র কবিতা হিসাবে এগুলি পাঠ করলে যে ফলশ্রুতি তৈরি হয়, সুরারোপিত গীত হলে তার ফলশ্রুতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়।

নজরুলের গজল গানগুলি বাংলা সঙ্গীত জগতে এক অনন্যপূর্ব সংযোজন। এগুলি কখনই নিছক বাণীপ্রধান কবিতা হিসাবে মনোহারী নয় যতক্ষণ না সুরারোপ করে গাওয়া হয়। বাংলা গজল গান তার গায়নভঙ্গি, বাংলা-উর্দু শব্দের সহাবস্থান এবং বিচিত্র রাগরাগিণীকেন্দ্রিক সুরজাল সৃষ্টির দ্বারা তার পরিবেশটিকে গড়ে তুলেছে যা অন্য গান থেকে স্বতন্ত্র। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন এবং ইসলামী গানও অসামান্য সৃষ্টি, সন্দেহ নেই। একজন অহিন্দু কবি হয়েও আশ্চর্য সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত কিম্বা কীর্তন রচনা সত্যিই বিস্ময়ের। এসব গানে তাঁর ভক্তিভাব নির্ভেজাল। এমনকি একথাও বলা চলে যে, ইসলামী গান ও শ্যামাসঙ্গীতের কবিকে আলাদা করে দেখা চলে না। প্রকৃত ভাবসাধকের কাছে দুইয়েরই মূল্য সমান। এইসব গানের বাণী ও সুরে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

সখি আমিই না হয় মান করেছিনু
তোরা ত সকলে ছিলি;
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি
কেন নাহি ফিরাইলি?

—এই গানের রচয়িতা হিন্দু কি মুসলমান তা বোঝার কোন উপায় আছে কি? আসলে, কবির তো খণ্ডিত দেশকাল নেই, কোন জাতভেদও নেই, তিনি সর্বদেশের, সর্বকালের, তাই তাঁর আন্তরিক আবেদনও দেশকালাতিরিক্ত। কীর্তন গানে কৃষ্ণমিলনে শ্রীরাধিকার মর্মব্যাকুলতা যেন প্রতিটি শব্দ ও সুরবিন্যাসে ঝরে পড়েছে, বলা যেতে পারে, কীর্তনের বিশিষ্ট সুরবিন্যাসেই এমনটা হওয়া সম্ভব হয়েছে। নজরুলের ইসলামি গানগুলির মধ্যে তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা ছিল হিন্দু-মুসলমানে ভেদজ্ঞান দূর করা তা তিনি যথাসাধ্য করার চেষ্টা করেছেন—

কেহ নয় উচ্চ কেহ নয় নীচ, মানুষ সমান সবাই।
এক জাতি এক দিল্ এক প্রাণ আমীর ফকিরে ভেদ নাই।
এক তক্‌বীরে জেগে উঠি, আমার হবেই হবে জয়।।

"আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়"—এই গানটির উক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে নজরুলের শুধু গীতরচনা নয়, তাবৎ সাহিত্যকর্মের মূল সত্যটি নিহিত। নজরুল মানুষের কবি, সর্বজনের, সর্বকালের। এই অখণ্ড বোধটিকে তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যখন তখন তাঁর উন্মুক্ত বন্ধনহীন বিশাল হৃদয়টি থেকে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছে তাও সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে আর কবিতা বা গান যাই হোক-না কেন, নজরুলের জনপ্রিয়তার এটি একটি বিশেষ কারণ।

নজরুলের অজস্র গানকে হয়ত সবসময় সপ্রশংস বিচারে আনা যাবে না। রচনা অজস্র হলে তার মধ্যে কিছু ত' অনুল্লেখ্য থেকে যেতেই পারে। কিন্তু সেকারণে কবির বিচ্যুতির প্রতি আঙ্গুল দেখানোর চেষ্টাটা উচিত কাজ বলে মনে করি না। কোন কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই তাঁদের অসম্পূর্ণতার দিকটিকে আমি দেখতে ভালবাসি না। যেহেতু আমরা রক্তমাংসের মানুষ, নানা সীমাবদ্ধতায় আমাদের অবস্থান সে কারণে শতকরা একশতভাগ সাফল্য কোন মানুষের জন্যই বরাদ্দ নয়। তাই নজরুল আমাদের কি দিতে পেরেছেন তা-ই আমার কাছে মহামূল্যের, যা পারেন নি তা তো আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া

নজরুলকে সাধারণত আমরা বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, ইসলামী সঙ্গীতের রচয়িতা ইত্যাদি বলেই সমাদর করে থাকি। কিন্তু একটি মানুষকে—তা যদি তিনি আবার স্রষ্টা হন—তবে তাকে সামগ্রিক বিচারের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই থাকে। অনেক কিছুর সমন্বয়ে একটি মানুষের পূর্ণতা।—আর সেই কারণেই প্রকৃতির কবি নজরুলকে স্বতন্ত্রভাবে জানাও আমাদের অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের রূপচিত্রণ নজরুলের গানে আছে, আমি তার মধ্যে বর্ষা-প্রসঙ্গই মূলতঃ আলোচনার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি।

নজরুলগীতি (অখণ্ড) আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত গ্রন্থটিতে প্রথম সংস্করণের ভূমিকাংশ উল্লিখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে নজরুলগীতির প্রথম পঙ্‌ক্তির যে তালিকা মুদ্রিত হয়েছে তার সংখ্যা ২৮৭২। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, আরো অন্ততঃ ১০০টি নতুন গান দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে হাতের কাছে আমরা ২৮৭২+১০০=২৯৭২ টি নজরুলের গান পাচ্ছি। তবে এই সমস্ত গানই নজরুলের রচনা কিনা তা নিয়ে নিশ্চয়ই সংশয় থাকতে পারে। আমি যে দ্বিতীয় সংস্করণ ধরে কাজটি করেছি তার প্রকাশকাল ১৪ রমজান ১৪০১-১৭ জুলাই ১৯৮১। ইতিমধ্যে আরো অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে নিশ্চয়ই যা থেকে নজরুলের নামে প্রচলিত অনেক গানই তাঁর রচনা নয় বলে প্রমাণিত হওয়া সম্ভব। যেহেতু সেই সম্পূর্ণ তালিকার এখনও কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থ আমি পাই নি সেকারণে পূর্বোক্ত গ্রন্থের বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ ধরেই অগ্রসর হলাম।

পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতে নজরুলের বর্ষা সম্পর্কিত গানের সংখ্যা প্রায় ৬৫-রও বেশি। এক বর্ষা ঋতুকে নিয়েই এত গান রচনা থেকে নিশ্চয়ই অনুমান করা চলে যে, বর্ষা নজরুলের অত্যন্ত প্রিয় ঋতু ছিল। নজরুলের সমগ্র জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা, দুঃখ-বিপর্যয়, অশ্রু-বেদনা সব কিছুর সঙ্গে বর্ষা ঋতুর এক অদৃশ্য বন্ধন, নিগূঢ় সাযুজ্য, প্রগাঢ় হার্দিক সম্পর্ক অনুভব করা যায়। বর্ষা ঋতুকে অবলম্বন করে সাধারণত প্রকৃতি, প্রেম, বিরহ-বিষয়ক গানই রচিত হয়ে থাকে। বর্ষার প্রকৃতি নজরুলের যেসব গানে মুখ্য হয়ে উঠেছে সেখানে বর্ষার ঘনঘটা, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, মেঘের ডম্বরুধ্বনি, অঝোর ধারায় বরিষণ, সচকিত বিদ্যুৎ, তরঙ্গ-উতরোল ঝর্ণা ইত্যাদি প্রকৃতির অজস্র আশ্চর্য সুন্দর রূপকে কবি বর্ণনা করেছেন তাঁর অনুপম শব্দমালার সাহায্যে। কবি তার বিশাল আয়ত দৃষ্টি নিয়ে বর্ষার এই সমগ্র রূপকে যেন দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরে ফেলেছিলেন। যেমন-(১) মেঘের ডমরু কাজ করান /বিজলী চমকায় / আমার বনছায় / মনের ময়ূর যেন সাজে।। (২) মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব-হাওয়াতে দোলা। (৩) বাজে মৃদঙ্গ বরষার ওই দিকেদিকে দিগন্তরে। (৪) শ্যামা-তন্বী আমি মেঘ-বরণা / দৃষ্টিতে বৃষ্টির ঝরে ধরণা।। (৫) রিমঝিম রিমিঝিম্ ঐ নামিল দেয়া। (৬) ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন / ভুবন গভীর বিষাদ মগন।। (৭) বর্ষা ঋতু এল এল বিজয়ীর সাজে / বাজে গুরু গুরু আনন্দ ডমরু অম্বর-মাঝে। (৮) স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী বর্ণা এস

মালবিকা। (৯) চমকে চপলা মেঘে মগন গগন। গরজিছে রহি' রহি' অশনি সঘন।। (১০) এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া। ইত্যাদি। এমন আরো বহু গানের উল্লেখ করা চলে যেখানে ঘন-গম্ভীর বিদ্যুত সচকিত রূপের সঙ্গে সঙ্গে চম্পা-যূথিকা মালতী-কেতকীর দুরন্ত সুবাস ও নয়ন মনোহর রূপে প্রকৃতি হয়েছে পূর্ণা। আকাশ এবং পৃথিবীর এই যুগ্ম সৌন্দর্যকে কবি একসঙ্গে ধরেছেন নানা গানে। যখন ঘনঘোর আকাশে মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে তখন কবির শব্দচয়ন লক্ষ্যণীয় — মেঘ-ডমরু, বেদনা-বিজুরি-শিখা, দামিনী, আনন্দ-ডমরু, বিদ্যুৎ তরবারী, তীর-বৃষ্টি, মেঘ-কুঞ্জর-সেনা, বিজলী-জরিন ফিতা, ভাদর-তটিনী, তিমির-কুন্তলা, জলদ-মৃদঙ্গ, ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতাল, ঝঞ্ঝার ঝল্লরী, বরষা-বেদিনী, অশনী-ডমরু প্রভৃতি। শব্দগুলির কোনটির মধ্যে মৃদঙ্গের ভারি ঘন আওয়াজ যা মেঘগর্জনের সঙ্গেই তুলনীয়, কোনটিতে বা তরবারীর মত তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্যুতের চমক, কোনটিতে কালো লম্বা চুলে আবৃত (যেন মেঘাবৃত) ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ ও পৃথিবী — এসবই কখনও চক্ষুরিন্দ্রিয়কে, কখনও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সচকিত করে তোলে, যেন এদের কল্পনেত্রে দেখা যায়, আওয়াজ শোনা যায়। বর্ষা যেমন আনন্দ-ডমরু বাজিয়ে সচকিত দামিনীসহ ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতালে আসে, তেমনি কখনও আসে রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ আওয়াজে, কখনও রুমঝুম ঝুম বাদলধারায়, মনের তলে জাগিয়ে তোলে মৃদ মধুর ধ্বনি, কত না- ভোলা মধুর স্মৃতি। রুম ঝুমঝুম আওয়াজে সজল কাজল নবমেঘের গৈরিক প্রান্তরে যে অনুপম ছবিখানি তা আজও স্মৃতির মুকুরে প্রতিচ্ছবি আঁকে, সকরুণ গীতি শোনায়। দুরন্ত বিজুরি-শিখা ক্রমশ মেঘ্‌লা-মতীর ধারা জলে তৃষ্ণা দূর করে শ্যাম দরশ-পরশ-ব্যাকুল ক'রে তোলে মনকে। প্রেমানুভবের এই অন্তর্লীন মুহূর্তে প্রিয়কে কাছে না পেয়ে প্রিয়া গেয়ে ওঠে বেদনার্ত চিত্তে — " মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি?" এতে শুধু নজরুল-রচিত গানই নয়, এ যেন নিশ্চিতভাবেই জীবনেরই ফেলে-আসা করুণ স্মৃতি-বিজড়িত হাহাকার যার সঙ্গে কবির জীবনের যোগ অনস্বীকার্য। এই ব্যক্তিগত যোগকে বিশ্বমানবচিত্তে সঞ্চারিত করে দেবার যে কৌশল, তা সুরে শব্দে, ছন্দে, আন্তরিকতায় কবির আয়ত্তে ছিল। প্রেমের এহেন আন্তরিক আকুলতা কবির প্রথম বিবাহের ব্যর্থতাকে কি মনে পড়িয়ে দেয় না? মনে কি হয় না যে, মেঘ-মেদুর বরষায় প্রেম-ব্যাকুল কবিচিত্ত নতমুখী নিরপরাধিনী ফেলে আসা অশ্রুমুখী বধূকেই স্মরণ করে হাহাকার করে ফিরছে? ঋতুচক্রের কালানুক্রমিক বিবর্তনে 'শাওন' ফিরে ফিরে এলেও 'সে ফিরে এল না' — বধূচিত্তের এই অশ্রুসজলতা কবি আপন চিত্ত দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন, অজস্র পুষ্পবৃষ্টিরূপে সৃষ্টি হয় একের পর এক প্রেমের গান — (১) বাদল ঝরে মোর নিভিয়া গেছে বাতি, (২) মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে। (৩) ঝড়ের বাঁশিতে কে গেল ডেকে। (৪) সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায় কাজল আকাশ ঘিরে। (৫) আজি এ বাদল দিনে কত কথা মনে পড়ে। (৬) এ ঘোর শ্রাবণ দিন কাটে কেমনে প্রভৃতি। এসব গানে কবির প্রথম যৌবনের বেদনাস্তব্ধ চিত্তের স্পর্শ পাওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৩৭খ্রী: ১লা জুলাই কবি তাঁর প্রথমা পত্নী নার্গিস আসর খানমের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

" আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কী অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের 'পরশমণি' না দিলে আমি 'অগ্নিবীণা' বাজাতে পারতাম না, আমি 'ধূমকেতু'র বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণরূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, সে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালোবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম. সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত মন্দারের মত চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সেই ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারে নি।"

বর্ষা মুখরিত শাওন দিনে সেই প্রথমা প্রিয়ার মলিন মুখচন্দ্রিমা কবিকে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা ব্যথাতুর করে তোলে আর গানে গানে কবি তাঁর অন্তরের অতলশায়ী আবেগকে উজাড় ক'রে দেন। রিম্ ঝিম্ বরষায় দীপ নিভিয়ে কবি যখন একাকী ক্রন্দনরত, তখন তাঁর মনে পড়ে 'সেই মন দে'য়া-নে'য়া'-র স্মৃতি। প্রিয়ার আগমনের আশায় প্রেমিকের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে 'পিয়া পিয়া' বলে পথ চেয়ে থাকে। কখনও অভিমানে চিত্ত হয় মলিন আর তখনই মন বলে ওঠে "ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপ্ন সম আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ পরে"। প্রেমের এইসব গানে প্রেম এবং বিরহ সুখ এবং দুঃখের মতই পাশাপাশি অবস্থান করে। এসব গানে কোন অপ্রাকৃত অপার্থিব ভাবের সন্ধান করতে গেলে ভুল হবে, জীবনের উষ্ণতায় গানগুলি তাপিত আর তাই তা আমাদের অনুভবের খুব নিকটেই। "বাদল ঝরে মোর নিভিয়া গেছে বাতি" গানটিতে কবির বিরহ-অভিমানী চিত্ত প্রিয়ার কাছ হতে দূরে — বাতি নিভে যাওয়া ঘরে ঝড়কে সাথী করে কাঁটার সেজ পেতে একাকী হতে চেয়েছে। আবার 'মেঘ মেদুর বরষায়' গানে প্রিয়ার জন্য হাহাকার, চিত্তের ব্যাকুলতা শ্রোতার অন্তরানুভূতিকে স্পর্শ ক'রে অশ্রুসজল করে তোলে। মাত্র দু'টি পঙক্তির এই গানটিতে প্রিয়াকে কাছে না-পাওয়া কবির বেদনা-দীর্ণ চিত্তের সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতির যে ভাবসাযুজ্য ঘটেছে, তা লক্ষণীয়। অথবা "রিম্ঝিম্ রিম্ঝিম্ ঝরে শাওনধারা গৃহকোণে একা আমি ঘুমহারা" গানটিতে কবিমন বিবাগী হয়েছে, অতীত দিনের নানা স্মৃতি ফিরে ফিরে এসে ছলছল ভাদরে চিত্তকেও সজল করে তুলছে! এমনি এক ভরা বরষায় প্রিয়াকে তিনি পেয়েছিলেন বলে স্বপ্ন সুখানুভব করেছেন। আবার "রিম্ ঝিম্ রিম ঝিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে" গানে কদম তমাল ডালে নটশ্যামের দোলনা দুলছে দেখে পুরনারী অধীর হয়ে উঠেছে ঘর ছেড়ে যাবার জন্য, অথচ অশনি-আঘাত গুরুজন ভবনবাসীর গর্জন তাকে বারবার বাধা দিচ্ছে, কিন্তু ঘনশ্যাম দরশনে যাবার জন্য প্রেমিকা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এসব গানে বৈষ্ণবপদাবলীর সুর শোনা যায়—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই।।

অথবা,

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি দরদর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।

কিম্বা, এইরকমই দুর্যোগের রাতে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণাভিসারে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর :—

কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

নজরুলের বর্ষার গানে মিলন পিয়াসী প্রিয়া কখনও কখনও অভিমানবশে এমনও মনে করে যে, তার প্রেমিক "না-জানি কোন্ দেশে কোন্ প্রিয়া সনে/রয়েছে ভুলিয়া নব হরষে।" প্রেমের এই বিভিন্ন আবেগ মরমী মানুষের কাছে চিরকাল একইরকম বলেই শ্রীরাধিকা এবং কবির প্রেমিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রেমের এইসব গানে কবির শব্দব্যবহার লক্ষণীয়—ধানী রঙ ঘাঘরী', 'মেঘ রং ওড়না', হৃদয়-যমুনা, মরম, মেঘ-বরণা, প্রিয়-দরশা, বন্ধু-মিলন-হরষা, মেঘলামতী, মেঘ-নটী, মেঘমালতী, বন-পাপিয়া, শ্যাম-পরশা, মধু-তিথি, বাদরিয়া, শ্যামলিয়া, কাজরিয়া, ঝুলনিয়া, মেঘ-নীল, নীপ-মালিকা, জল-নূপুর, বিষাদ-মগন, বন-কুন্তলা, মেঘ-চন্দন, বরিষণ এবং এমন আরো বহু শব্দ চয়ন করা যায় যেখানে আ-কারান্ত, ই-কারান্ত বা ইয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রাধান্য আছে। যুক্ত ব্যঞ্জনগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শব্দ তৈরি করায় শব্দে আশ্চর্য শ্রুতি-মধুরতা ও পেলবতা, স্নিগ্ধতা এসেছে যা প্রেমের কোমল মধুর অনুভবের জন্য নিতান্ত জরুরী। যেমন হরষা, বরষা, দরশা, পরশ, মরমী, বরণা ইত্যাদি। আ-কারান্ত শব্দে ধ্বনির বিস্তার চিত্তকে অনেক বেশি অধিকার করে রাখে এবং বর্ষার অনন্ত ধারা প্রবাহের সঙ্গে বড় মানানসই। গাগরিয়া, শ্যামলিয়া, কাজরিয়া, ঝুলনিয়া শব্দগুলি প্রেমিকের প্রতি স্নেহসূচক বলে মনে হয়। প্রেমের আকুলতায় হৃদয়ের যে উথাল-পাথাল অবস্থা, 'হৃদয়-যমুনা'র চেয়ে সুপ্রযুক্ত উপমা সেখানে যেন আর হয় না। প্রেমিকার ঘাঘরার রং ধানী এবং ওড়নার রং মেঘ—রঙের এমন অসামান্য কবি-কল্পনা নজরুলের কাছে আমাদের চিরদিনের জন্য ঋণী করে রাখে। কবির সমস্ত মন-প্রাণ- আত্মা যেন বর্ষাকে সজীব প্রাণবন্ত এক সত্তারূপে গ্রহণ করেছে। বর্ষা সেখানে কখনও প্রেমিকাকে বিরহাতুর করে তোলে, কখনও করে তোলে চঞ্চল, কখনও ভীত সন্ত্রস্ত, কখনও বা অভিমানী, কবি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে বর্ষার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে পড়েছেন।। ঋতু আর তখন কেবলমাত্র বহিঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট অবস্থা নয়, কবির অন্তরের বিশেষ অবস্থার নামান্তরমাত্র।

বর্ষার বিভিন্ন গানে অজস্র রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন নজরুল—সারং মিশ্র,

দেশ, মধুমাধবী সারঙ, খাম্বাজ-বাহার, পিলু-বারোয়াঁ, পিলুকাফি, কাজরী, মিশ্র-মল্লার, নটমল্লার, কাজী, মেঘ-মল্লার, মূলকাফি, কাজরী, মিশ্র মল্লার, সুরদাসী মল্লার, জয়-জয়ন্তী, মেঘ-মল্লার, মূলতান-কানাড়া, দেশ জয়জয়ন্তী, দরবারি টোড়ী, দরবারি কানাড়া, পিলু, দুর্গা প্রভৃতি। ধরে নেওয়াই যেতে পারে যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ঠিক এতটাই দখল নজরুলের ছিল। একটি মাত্র রাগের ব্যবহারে গানে যে সুর সংযোজন হয় তার চেয়ে একাধিক রাগ-রাগিণীর ব্যবহারে গানের এক এক অংশে এক এক ধরনের সুরবৈচিত্র্য গানের ভাব ও অনুভবকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে রাখে। স্বভাবতই রসিক শ্রোতা মিশ্রসুরের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হন। এও এক নতুনত্বের অনুসন্ধান। গান নিয়ে যে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নজরুলের ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অথচ রীতিমাফিক গান রচনা বা সুরপ্রয়োগ ত তাঁর ঘটেনি—আকস্মিক বিদ্যুত চমকের মতই তাঁর অধিকাংশ গানই আকস্মিকভাবে রচিত। জীবনের প্রায় শুরু থেকে প্রাপ্তির চেয়ে নিঃস্বতা, রিক্ততা তাঁকে বড় বেশি বিপর্যস্ত করেছে, অথচ সেই ভাঙ্গা অন্তর থেকে এমন অপরিমেয় অসামান্য গীতরচনা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধকেই জাগিয়ে তোলে আর মনে হয় বেদনা থেকে যে সুমধুর সুরলহরীর সৃষ্টি, তা যেন, আমাদের চিন্তাচর্চায় প্রবাদ-প্রবচনের মতো বহু ব্যবহৃত মনে হলেও উপলব্ধির সত্যে চিরন্তনই থেকে যায়— "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রকে উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও শিল্পী বলেই আমরা জানি। সেই সময়কালে তিনি একদিকে যেমন বাংলা উপন্যাস, বিবিধ বিষয়াশ্রয়ী মননশীল প্রবন্ধ ও রসরচনার একমাত্র সার্থক স্রষ্টা, তেমনি অন্যদিকে সঙ্গীতরসিক, সঙ্গীতবোদ্ধা, সঙ্গীতশাস্ত্র বিশ্লেষক, সঙ্গীতের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচকও বটেন। তিনি যেহেতু উনিশ শতকের বাংলার শ্রেষ্ঠ Rationalist, সেকারণে সব কিছুকেই যুক্তি-বিচার দিয়ে যাচাই ও বিশ্লেষণ করে নেবার আগ্রহও ছিল অপরিসীম। সঙ্গীত — যাকে সাধারণত মনে হতে পারে রসেরই আকর, তাও যে বিজ্ঞানের উপর নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞানকে আশ্রয় করেই রসপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তা চমৎকার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতানুরাগের সূত্রপাতটি সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল থাকতে পারে। 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থের লেখক শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধূলায় বড় একটা অনুরাগী ছিলেন না; বাল্যকাল হইতেই তিনি পাঠানুরাগী ছিলেন।" যখন তাঁর ত্রিশ বছর বয়স "এই সময় সঙ্গীত-শিক্ষায় ঝোঁক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাঁটালপাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদুভট্ট তান্‌রাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদুভট্টের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তান-লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমোনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।"

শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরো জানাচ্ছেন যে, একদিন রঙ্গমঞ্চে 'মৃণালিনী'র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেখানে গিরিজায়ার কণ্ঠের গানের সুর তাঁর ভাল লাগে নি, তিনি রঙ্গালয় পরিত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিলেন বাড়িতে। পরে তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরকে গানটির (বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে) নতুন সুর শিখিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত এই তথ্যটিও জানা থাকা ভালো যে, সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে অভিনয় করা হত।

কেবলমাত্র শ্রীচট্টোপাধ্যায়ই নন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতানুরাগ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বঙ্কিমচন্দ্র -কাঁটালপাড়ায়" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীর "আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বাড়ীতে কথকতা হতে দেখেছেন, "ধরণীকথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চস্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি। কিন্তু এখনো সে-সুর কানে লাগিয়া আছে।"

শ্রীশাস্ত্রী মহাশয় আরো জানিয়েছেন : "বাংলায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি, কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি বঙ্গদর্শনের তহবিল

খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেন, ইহাও দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুন্‌গুন্ করিয়া ছাড়াগলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনো শুনি নাই।"

তাল-মান-লয় সম্পর্কে সজাগ বঙ্কিমচন্দ্রের অতএব সঙ্গীতশিক্ষার একটি ভিত্তি ছিল, তা স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত।" একথার প্রমাণ আমরা আমাদের জীবনাচরণে প্রতিমুহূর্তেই লক্ষ করে থাকি। আমাদের জীবনে এমন কোন অবকাশ নেই যা সত্যই সঙ্গীত-বিচ্ছিন্ন। আনন্দের, উৎসবের, নিশ্ছিদ্র অবকাশের মুহূর্তে, এমনকি শোকে-দুঃখেও আমরা গানের মধ্যে সার্থকতা ও সান্ত্বনা—দুই-ই খুঁজি। সঙ্গীত আমাদের আনন্দেরও প্রকাশ, দুঃখেরও অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : "মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ সঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম।" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতেও পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত।" যেহেতু সঙ্গীতে স্বরের উচ্চাবচতা থাকে সেকারণে মনোভাবেরও নানা অবস্থা সঙ্গীতের মাধ্যমেই প্রকাশ করা যায়। কখনও স্বরে লাগে আত্মনিবেদনের আকুতি, কখনও উচ্চগ্রামে খুশির আমেজ, কখনও বিশেষ ছন্দের প্রয়োগে এবং বীরত্বব্যঞ্জক শব্দের ব্যবহারে দৃপ্ত স্বরভঙ্গীতে সমরগীতি, কখনও কণ্ঠের নানা কারিগরিতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, কখনও উদাসী সুরের প্রয়োগে জীবনের নানা অভিজ্ঞতাঋদ্ধ লোকগীতি, কখনও একটানা সুরে গাওয়া শ্রমজীবী মানুষের শ্রমগীতি, কখনও আবেগাপ্লুত আত্মনিবেদনে ভক্তিগীতি এবং এমনই আরো অনেক। সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন : "স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত।"

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, প্রায় এই একই কথা বলেন রবীন্দ্রনাথও : "কবিতা ও সংগীতে আর কোনো তফাত নাই, কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাবপ্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র। .....মনের একটিমাত্র স্থায়ী ভাব বাছিয়া লওয়া, ভাবশৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সংগীতের কাজ। মনে করো, আমি বলিলাম, 'হায়'। কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। ....সংগীত সেই 'হায়' শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে, 'হায়' শব্দের হৃদয় উদ্ঘাটন করিতে থাকে, 'হায়' শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সংগীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, 'হায়' শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়।"—যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বরবৈচিত্র্য অনুসারে ভাবের বৈচিত্র্যও ঘটে থাকে। সেই ভাববৈচিত্র্য নিয়েই সঙ্গীতের পসরা সজ্জিত হয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রশ্ন এই যে, ভাববৈচিত্র্য সঙ্গীতের বিশেষ সম্পদ ত' বটেই, কিন্তু 'সঙ্গীত' বলতে কি বুঝব? সে কি নেহাতই সুর সংযোজিত ভাবের প্রকাশমাত্র? বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন : "সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু সুর কি?" বঙ্কিমচন্দ্র সুরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : "কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণু মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারিপার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়; যেমন সরোবর মধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভুত হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কল্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণ স্নায়ুতে নীত হইয়া মস্তিষ্কমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মসূর সাবর্তি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বারের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতামাত্র-শব্দ প্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ "বেসুর" অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত।"

বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র একজন সঙ্গীতানুরাগী হিসাবে সঙ্গীতকে বুঝতে চান নি। তাঁর মনে বৈজ্ঞানিকসুলভ অনুসন্ধিৎসা থাকার কারণেই সঙ্গীতকেও বিজ্ঞানের আলোয় বুঝবার চেষ্টা করেছেন। সেকারণে প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামতও জেনেছেন, কর্ণের গঠন প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং তা একজন বিজ্ঞানীর মত করেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেনও।

সুর সৃষ্টি হলেও কিন্তু যে কোন সুরই প্রীতিবর্দ্ধক হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, মনুষ্য সমাজেও আপাতসুন্দর নির্দোষ মানুষেরও কিছু-না-কিছু দোষ থাকেই—"নির্দোষ সুন্দর মনুষ্য" পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তারই মধ্যে ওইসব আপাতনির্দোষ মানুষ দেখেই আমরা মনে মনে এক আদর্শ মূর্তি তৈরি করে নিই। এই মূর্তি কল্পনা করেই নির্দোষ "প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। ...যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গীই নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটিমাত্র সামান্য

কথায় এত শোক, এত প্রেম বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।"

কোন্ কোন্ ধরনের ভাবপ্রকাশ করা যায় সে সম্বন্ধেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষক বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ব্বলোকমধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসাপ্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দ্ধকমাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলস্বভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্রুরভাব নহে; ভক্তি ও প্রেমবাচক।"

রাগদ্বেষাদি যাতে প্রকাশ পায় তা ভাবের সূক্ষ্মতাবঞ্চিত বলে গীতমধ্যে নয়। তাছাড়া সেসব ছন্দোবদ্ধ রচনাকে সুরারোপিত কথোপকথন মাত্র বলা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, শব্দপ্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের সৃষ্টি করে, সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত, সঙ্গীতের জন্য প্রয়োজন কণ্ঠভঙ্গীর চরমোৎকর্ষ, কণ্ঠভঙ্গই মনের ভাবপ্রকাশক এবং সঙ্গীতই মনের সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'শব্দ' বলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেন 'কথা'। তিনি বলেন : "আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে — কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।" রবীন্দ্রনাথ এখানে আরো একধাপ এগিয়ে বলেন যে, সঙ্গীতের চেয়ে কবিতা অনেক উন্নত ভাব প্রকাশ করতে পারে। তার কারণ "শূন্যগর্ভ" কথার কোন আকর্ষণ নাই — না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।"

যাহোক, সঙ্গীত বিচিত্র ভাবপ্রকাশক, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতালোচনার আরো গভীরে চলে যেতে চান। তাই তিনি সঙ্গীতাশ্রিত বিভিন্ন রাগরাগিণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথা মনে রেখেই আলোচনা করেন। তাঁর মতে, "যেমন তেত্রিশটি আদি দেবতা হইতে

তেত্রিশ কোটি দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্রপৌত্রাদির সহিত হিন্দুসঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনাকুতূহলিনী। ....এই জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি ব্রহ্মা। ...ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্ম্মুখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মাণীও থাকা চাহি। একটি ব্রহ্মাণীও হইল। ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন।

.....সৃষ্টিকর্ত্তা...মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্রকলত্রাদিযুক্ত, সর্ব্ব বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ—পলিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে "বাবু" করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদিও উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগরাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি জন্মিল।"

রাগরাগিণী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ প্রায় গল্পের মত। অত্যন্ত কঠিন বিষয়কেও কীভাবে সহজ শুধু নয়, সরস করেও বলা যায় পূর্বোক্ত অংশ তার চমৎকার নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই ইতি টানছেন না। তিনি বলছেন "আগে কহ আর।" সেই সূত্রে তাঁর বক্তব্য যে, কোন এক সময় হয়ত আমরা কোন শোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি কানে শুনলাম, কিন্তু নারীটিকে চোখে দেখলাম না। ক্রন্দনধ্বনির বিশেষ স্বরটিই আমাদের জানিয়ে দিল যে, মাতা শোকাতুরা। এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হ'ল এবং পরে যখন ওইরকম কোন ধ্বনি শুনলাম তখন বুঝলাম, এ ধ্বনি শোকের। বিপরীতক্রমে, কোন শোকাতুরা মাতাকে চোখে দেখলাম, কিন্তু কোন ধ্বনি শুনলাম না। ভবিষ্যতে যদি কোন নারীকে ওইরূপে দেখি তবে বুঝব যে, নারীটি শোকাতুরা। এইবার যখন শোকধ্বনি ও শোকাতুরা মাতার মূর্তি উপর্যুপরি মনে পড়তে থাকে বা অভিজ্ঞতায় ধরা দিতে থাকে তখন দুইয়ে মিলে শোকের একটি বাহ্য মূর্তি স্বভাবতই আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় এবং তখনই শোকধ্বনিও সাকার মূর্তি পরিগ্রহ করে। এইরকম আনন্দ বিষাদ সব ভাবেতেই হতে পারে এবং তার সাকার মূর্তি কল্পনাতেও আসতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন : "ধ্বনি এবং মূর্ত্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ-রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া, তাঁহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্য্যদিগের আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল।

.....অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর যাহাকে কবিরা "আবেশ" বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। ...প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই

বিরাহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জ্জনে একাকী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসনভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণী সকল আসিয়া, তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর — কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এইরূপ অন্যান্য রাগরাগিণীর ধ্যান। মূলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিনী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বর পরিধানা নানালঙ্কার ভূষিতা— ইত্যাদি।"

একটু ভিন্ন সুরে রাগরাগিণী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন : "আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড়ো বড়ো আধারে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। যখন কল হয় নি তখন কলকাতার গঙ্গার জল যেমন করে জালায় ধরা হত। যজ্ঞকর্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে সেই রস পরিবেশন করতে পারেন কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হতে সেটা বয়ে আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, সে যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ-বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শুন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিভিন্ন রাগরাগিণীর সাকার মূর্তিই কল্পনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে সাকার মূর্তি কল্পনার পরে দীর্ঘ অনুশীলন অন্তে নিরাকার সাধনায় যাওয়া চলে। মহান সঙ্গীতশিল্পীরা তখন বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বর্তমান রাগরাগিণীকেই অনুভব করার চেষ্টা করেন। তখনই সঙ্গীত হয়ে যায় পূজা বা সাধনা। সেই কারণেই ভারতবর্ষে সঙ্গীতসাধনা কথাটি প্রচলিত।

বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনায় যেসব মূর্তির ধ্যানের কথা রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে বলেছেন, তা নিয়ে যে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। যেহেতু এই মূর্তিধ্যানের কোন বাস্তবভিত্তি নেই, তা শুধুই কল্পনামাত্র, সেকারণে কল্পনায় রাগ-রাগিণীর ভিন্নতর মূর্তির ধ্যান করাও অসম্ভব নয়। তবে পরম্পরাক্রমে কোন মূর্তিধ্যান যদি সংস্কারে পরিণত হয় তখন তাকে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন একটা মতদ্বৈধতা দেখা যায় না : "তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, কোমলসুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটিভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেও তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে।....এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের

আধিক্য জন্মে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গ ।তসুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক।...সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক তালবোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না।" এই কারণেই অভ্যাস বা কান তৈরী হয়নি যাঁর তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতা নন।

সঙ্গীতশাস্ত্রের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে রাজপুত্র-রাজকন্যাগণ যে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতেন তার মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যা অন্যতম। তিনি বলেছেন যে, আমাদের দেশে, অষ্টাদশ-উনিশ শতকে, অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গীতশিক্ষা কিম্বা সঙ্গীতচর্চা ছিল নিষিদ্ধ। ফলে গৃহে আনন্দের আবহাওয়ার অভাব ঘটত। বঙ্কিমচন্দ্র এমনও মনে করেন যে, যদি পুরস্ত্রীগণ অন্তঃপুরে সঙ্গীতচর্চা করতে পারতেন তাহ'লে "গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত" হত, "বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত" হতে পারত। কারণ প্রথমতঃ "নির্ম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ"; দ্বিতীয়তঃ "সঙ্গীত প্রিয়তা হইতেই অনেকের বারস্ত্রীবশ্যতা জন্মে।" মানুষের স্বাস্থ্য ও চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সঙ্গীতবিদ্যা সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন : "যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্ত প্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য।"

"সঙ্গীত" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "সঙ্গীত সুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক", আবার ভিন্ন প্রবন্ধে বলেছেন, "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত"—এই দুই মন্তব্যের মধ্যে আপাতভাবে স্ববিরোধিতা আছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন সঙ্গীত মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নয়, তখন বিশেষ ধরনের সঙ্গীতে অনুরক্ত শ্রোতার কথা মনে রেখেই মন্তব্যটি করেন যার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। শ্রোতা যে শ্রেণীর, সঙ্গীত যদি তার অনুগামী না হয় তাহলে সঙ্গীত সুখানুভবে বিঘ্ন ঘটার অবশ্যই সম্ভাবনা থাকে। আবার যখন বলেন যে, গীত মনুষ্যের স্বভাবজাত তখন সঙ্গীতের কোন শ্রেণীবিন্যাসের প্রসঙ্গ আসে না। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই সুরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা মোহ থাকে। শিশুর শ্রবণশক্তি তৈরি হবার পর যে কোন বাদ্যযন্ত্র কিম্বা গান হাল্কাসুরে বাজালেই তার অশান্ত চঞ্চলতা মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। বড়দের ক্ষেত্রে আপনমনে কাজ করার সময় অনেকেই গানের সুর গুণ গুণ করতে থাকেন। অনেক সময় কোন একটি গান বা কোন একটি গানের বিশেষ একটি পঙ্ক্তির সুর কিছুটা নিজের অজ্ঞাতেই বার বার গাওয়া হতে পারে। সেখানে সেই ব্যক্তির চেতনায় কোন এক সময় ওই বিশেষ গানটি কিম্বা পঙ্ক্তিটি অনুরণন তুলেছিল, এখন তারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে গীত সুর সুরেলা অথবা বেসুরো এসব প্রশ্ন আসে না। কাজের সঙ্গে সেখানে সুরের একটা অন্তরঙ্গ সখ্যতা তৈরি হয় যা কাজকে

সহজতর করে তোলে। এখানেই গীত মনুষ্যের স্বভাবজাত। যিনি গাইবার অধিকারী তিনিও গাইতে পারেন, যিনি তেমন অধিকার অর্জন করেন নি তিনিও গাইতে পারেন কেননা "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত।" সেখানে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সুরপ্রবাহ বহমান তার সঙ্গে মানুষের একটা স্বাভাবিক যোগের সম্পর্ক ঘটে আর তাই মানুষ প্রকৃতি হতে কখনই বিচ্ছিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন "নীরব" কবিত্বের কথা বলেন বা বলেন "একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে" — তখন কবি বা গায়কের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার কথাও এসে পড়ে। যিনি গায়ক তিনি গানকে সুরের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেন, শ্রোতাও গায়কের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সুর মেলান, নতুবা গায়কের গান শ্রোতার কাছে পৌঁছয় না। এই ক্ষেত্রে শ্রোতা এক হিসাবে নীরব গায়কও বটেন। গায়কের গান শ্রোতার অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারলে সঙ্গ ।তের সার্থকতা ঘটে না। এখানেও "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত" মন্তব্যটির অর্থ বোঝা যেতে পারে।

সঙ্গীত যে ভাবকে প্রকাশ করে তার জন্য প্রয়োজন শব্দ, বাক্য প্রভৃতির। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন : "অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।" একথার অর্থবোধে কোন অসুবিধা নেই। সঙ্গীত যদি ভাবপ্রকাশক হয় তবে তাকে শব্দাশ্রয়ী, বাক্যাশ্রয়ী এবং সুর ও ছন্দাশ্রয়ী হতেই হবে। শব্দ ভিন্নও ভাবপ্রকাশের অন্য উপায় থাকলেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শব্দই ভাব প্রকাশের আশ্রয়। তবে আমরা জানি, সঙ্গীত সূক্ষ্মতম ভাবকেই প্রকাশ করে বলে তাকে কেবলমাত্র অর্থযুক্ত বাক্যাশ্রয়ী হলে চলে না, সে অর্থের সঙ্গেও ব্যঞ্জনার সংযোগ থাকা জরুরী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, —স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী।...সত্য বটে যে, গীতিকাব্য লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটকারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।" সঙ্গীত সম্পর্কে একথা সর্বৈব সত্য।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছিলেন যে, যখন আমরা কোন কবিতা পড়ি তখন কবিতাটিকে কেবলমাত্র কতগুলি কথার সমষ্টিরূপে দেখিনা, কথার সঙ্গেই ভাবের সংযোগটিকেও বোঝার চেষ্টা করি। কবিতায় ভাবই মুখ্য লক্ষ্য, কথা ভাবের আশ্রয় হিসাবে সেখানে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে, কবিতা ও সংগীতে প্রভেদ কী?

আমাদের ভাবপ্রক্যাশের দু'টি উপকরণ আছে — কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। ....কথোপকথনে আমরা যে-সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি সংগীতে সে সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। ....সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। ...সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ....মিষ্টসুর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই ....।"

এই ভাব বিভিন্ন ভাবাত্মক সঙ্গীতে বিভিন্ন ছন্দকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় : "গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।"

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বাস্তব বিশ্লেষণে বলেছেন যে, সঙ্গীতের পারিপাট্য নির্ভর করে "স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য"-র উপর। দু'টিই পৃথক পৃথক ক্ষমতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ লাভ করে। এমন হতেই পারে যে, যিনি "স্বরচাতুর্য্যে"র অধিকারী তার "শব্দচাতুর্য্য" তেমন নেই অথবা যাঁর "শব্দচাতুর্য্য" আছে তাঁর "স্বরচাতুর্য্য" নেই। এ বিষয়ে বলা যায় যে, পূর্বে যাঁরা "শব্দচাতুর্য্য"-এর অধিকারী হয়ে গান রচনা করেছিলেন তাঁরা "স্বরচাতুর্য্যের" ও অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলের মত কবি-গায়কদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এঁরা একই সঙ্গে গান রচনা করেছেন এবং গেয়েছেন। কিন্তু এ ধরনের প্রতিভা সত্যই বিরল। বর্তমানে গান রচনা করেন গীতিকার, সুর আরোপ করেন সুরকার, গায়ক গান করেন। এইসব কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "দুইটি ক্ষমতা একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে।" এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়ে: "যে-মানুষ রচনা করে আর যে-মানুষ ভোগ করে।" তবে রবীন্দ্রনাথ রচয়িতা ও ভোক্তার মধ্যে অন্য আর একজনের ভূমিকাকেও বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি ওস্তাদ বা গায়ক—"গীতিকথায় আরো একজন প্রবেশ করেছে। রচয়িতা ও শ্রোতার ফাঁকটার মধ্যে আছে ওস্তাদ। মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্যপর্বতের মতো বাধাও হতে পারে আবার সুয়েজ ক্যানালের মতো সুযোগও হতে পারে। ... রসের স্রষ্টা ও রসের ভোক্তা এই দুইয়ের উপযুক্তমত সমাবেশ, সংসারে এইই তো যথেষ্ট দুর্লভ—তার উপরে আবার রসের বাহনটি—ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড়ো কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।"

একটি গীতধর্মী কবিতা কেমন করে একটি সার্থক গানে পরিণত হতে পারে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এইরকম : "যে-মানুষ গান বাঁধবে আর যে-মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা সংগম। যে-গান গাওয়া হচ্ছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয় সে যে তখন তখনি জীবন-উৎস হতে তাজা উঠছে এটা অনুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল এই যে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড় মেলে কিন্তু সর্বদা মেলে না।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : "শোনবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শোনাবার নয়।" এই শোনবার প্রতিভা অনুশীলনের মধ্য দিয়েও তৈরি হতে পারে আবার অনুভূতির প্রগাঢ়তায়ও তৈরি হতে পারে। পূর্বের আলোচনাটিই এখানে আবার স্মরণ করতে বলি, "একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুইজনে।" গানের রচয়িতা ও পরিবেশক যদি যথার্থ গুণী হ'ন তবে শ্রোতার অবশ্যই বাড়তি প্রাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে রচয়িতা ও পরিবেশক স্বতন্ত্র হলেও কোন ক্ষতি নেই।

ইউরোপীয় শক্তির সংসর্গে আমরা এদেশবাসী আপনাকে বিস্মৃত হতে পারি বলে আমাদের আশঙ্কা চিরকালই ছিল। এমনটা যে ঘটে নি, তাও নয়। উনিশ শতকে ইংরেজ-সংস্পর্শে সত্যিই আমরা ছিলাম আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা দিশাহারা হয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে যে সরে গিয়েছিলাম, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কিন্তু কালক্রমে সেই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েও আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের শক্তিতে আস্থা অর্জন করতে চেয়েছি। "য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগিয়েছে; তা যতই বলবান হয়ে উঠছে ততই অনুকরণের হাত এড়িয়ে আত্মপ্রকাশের পথে আমাদের অগ্রসর করে দিচ্ছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাচ্ছে তার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রয়েছে। আমার বিশ্বাস সংগীতেও আমাদের সেই বাইরের সংস্রব প্রয়োজন হয়েছে। তাকে প্রাচীন দপ্তরের লোহার সিন্দুক হতে মুক্ত করে বিশ্বের হাটে ভাঙ্গতে হবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হলে আমাদের সংগীতকে আমরা সত্যকার বড়ো করে ব্যবহার করতে শিখব।"

রবীন্দ্রনাথের মতই বঙ্কিমচন্দ্রও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পর্কে মোটেই অসহিষ্ণু ছিলেন না। দেশী-সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর যে বিশেষ দুর্বলতা ছিল তা নিশ্চিত। কিন্তু সমালোচক হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দেন যখন বলেন: "সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গ ।তবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য।" এই সঙ্গীতবিদ্যা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র দেশী-

বিদেশী সকলপ্রকার সঙ্গীতকেই বুঝিয়েছেন।

কমলাকান্ত ওরফে বঙ্কিমচন্দ্র তো এইরকমই চিত্ত প্রসন্ন করা মধুর কণ্ঠে মধুর গীতি শুনে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কে গায় ওই?" যে গায়ক গান গাইছে তার কণ্ঠ মধুর, সময়কালটিও মধুমাস, মনের সুখের সমস্ত মাধুর্য ঢেলে গাওয়া সেই একা পথিকের গান কমলাকান্তের চিত্তকে আলোড়িত করে তুলেছে। কমলাকান্তের চিত্তের আলোড়ন ত আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তেরই আলোড়ন। ওই গীত পিছনে ফেলে আসা যৌবনকে, 'সুহৃদ্‌বর্গকে, অকারণ উচ্চ হাসিকে, অপ্রয়োজনের কথাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আর তারই ফলে কমলাকান্তের "ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল।" সঙ্গীত যেমন আমাদের বর্তমানকে আনন্দমুখর করে তুলতে পারে তেমনি অতীত স্মৃতিকেও নতুন করে অনুভব করাতে পারে। সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জুড়ে সঙ্গীতের অবস্থান। যথার্থ সঙ্গীত একই সঙ্গে একারও যেমন, বিশ্বেরও তেমনি। আমাদের সঙ্গীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটি ধীরে ধীরে অবারিত করে দিয়ে জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করে আনে। রবীন্দ্রনাথের এই কথাই সঙ্গীত বিষয়ে যথার্থ অনুভব, তাই আমরা মেনে নিই : "আমাদের সংগীত একের গান — একলার গান; কিন্তু তা কোণের এক নয় তা বিশ্বব্যাপী এক।" কমলাকান্তের একাকীত্বও শেষ পর্যন্ত আপন সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বসংসারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। সেই সময় বিশেষ মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত ছাড়াও বিশ্বসংসারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে যে অনন্ত গীতি তা-ই যেন কমলাকান্ত ওরফে বঙ্কিমচন্দ্র শুনতে পেয়েছেন : "উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল।.....প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিণী — ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয় তন্ত্রী বাজিতে থাকুক।" এই অনুভবেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার সুর।" কমলাকান্তের একক সত্তা বিশ্বচৈতন্যের মহাসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়ে এক গভীর জীবনভাবনার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

সঙ্গীত কীভাবে স্মৃতি ও অনুভূতিকে জাগ্রত করে তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর "একটি গীত" রচনাটিতে কমলাকান্ত ওরফে বঙ্কিমচন্দ্র "এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো/ নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি" গানটি প্রসন্ন গোয়ালিনীকে শোনাতে চেয়েছেন। প্রসন্ন গোয়ালিনী সংসারী নারী, তাই গানটির প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করে নি। কিন্তু কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্র যে অনুভূতিতে মগ্ন হয়েছেন তা এইরকম : "যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই — মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর — শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই — এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।" এই গীতের অংশমাত্র

বঙ্কিমচন্দ্রকে নিবিড়তর মগ্নতার জগতে নিয়ে গেছে যার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বসংসার-জীবন ও জড়জগত জড়িয়ে আছে : "ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল — এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল, সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্যজীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্য হৃদয়কামনা। মনুষ্যহৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো। ...জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি — "এসো এসো বঁধু এসো।" বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার আকুতিকে এই একটি পঙক্তির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত বিশ্বের আকুতিতে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। এশুধু তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিতৃপ্তি নয়, এ এক অতীন্দ্রিয় নিবিড় আকর্ষণের আকাঙক্ষা যা তাৎক্ষণিকতা অতিক্রম করে হয়ে পড়ে চিরন্তন। সাধারণ একটি গান কেমন করে এমন অতীন্দ্রিয় সংবেদনায় গায়ক ও শ্রোতাকে আবিষ্ট করে ফেলে এই গানটি তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। সমস্ত গানটির মধ্য দিয়ে এক গভীর দার্শনিক উপলব্ধির জগতে ঘটেছে গায়কের উত্তরণ। সঙ্গীতের এই অসীম ব্যঞ্জনাই রসিকজনের যথার্থ প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি গায়ক ও শ্রোতার তরফে যদি সম্পূর্ণ হয় তবেই উভয়ের অন্তরে ঘটে পরিপূর্ণ সংযোগ। হৃদয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে শুধু কলাকৌশল প্রদর্শনের দ্বারা ওস্তাদী দেখান যেতে পারে, কিন্তু কোন অনুভূতির কেন্দ্রে পৌঁছন যায় না।

"তোমায় যখন পড়ে মনে, / আমি চাই বৃন্দাবনপানে," পঙক্তি দু'টি কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্রকে অতীত স্মৃতিচারী করে তুলেছে : "আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে — ...সুখ মনে পড়িল, চাহিব কোন্ দিকে? সুখ গিয়াছে—সুখচিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে? ...বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশানভূমি প্রতি চাই। ....তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি ....তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায় .....তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? ....বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের মুখ আর দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি....যদি গঙ্গার অতলজলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন।" সমস্ত অংশটির মধ্য দিয়ে কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যপূর্ণ স্মৃতির মন্থন এবং সব কিছু বিনষ্ট হওয়ার হাহাকার অন্তরকে দীর্ণ করে দেয়।

পঞ্চম স্বরটি সঙ্গীতে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বর—অনেকসময় গায়ক ওই স্বরে বিশ্রাম নেন, কখনও বা স্বরটির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে স্বরটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়। সেই পঞ্চম স্বরে যখন কোকিল ডেকে ওঠে 'কু-উঃ', তখন কমলাকান্ত আনমনা হতে

পারেন না : "একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু-উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু-উ রবটি আমি বড় ভালবাসি।" কোকিলের 'কু-উঃ' ডাকের ব্যাখ্যা করেছেন কমলাকান্ত : "কু-উঃ বটে'—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব — নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু ক্কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না।

.....যাহা মিষ্টি, তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,— সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট। ....আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী।....তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই — আনন্দ আছে। ....তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভালবাসিস্ — আমিও তাই; তুই পঞ্চম স্বরে কাকে ডাকিস? ......যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি। ....এই অনন্ত জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি ...কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই — অমানুষী ভাষা পাই আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।" কমলাকান্ত 'অমানুষী' ভাষার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন কেননা 'মানুষী' ভাষা সীমার বন্ধনে আবদ্ধ, তা যেন কোন অনির্বচনীয়কে ব্যক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। কোকিল তার অমানুষী ভাষার সাহায্যে তার অভিপ্রেত অপার্থিব চেতনার জগতে পৌছতে চায় যা বঙ্কিমচন্দ্রেরই মানসিক বাসনা।

সঙ্গীতরসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নানাভাবে গানের ব্যবহার করেছেন। কখনও পরিবেশ-সৃজনে, কখনও চরিত্র পরিস্ফুটনে, কখনও কারুর অনুরোধে অথবা আপনমনে গান এসেছে নানারূপে। যে ভাবেই হোক-না-কেন, বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা তত্ত্বগতভাবে বলেছেন : "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়।" সঙ্গীতের এই ভাবপ্রকাশক্ষমতাকেই বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিমলা চলেছেন গড়মান্দারণ পরিত্যাগ করে শৈলেশ্বরের মন্দিরে, সঙ্গে আছে গজপতি—বিমলা যাকে সম্বোধন করেছেন 'রসিকরতন' বলে। বিমলা চলেছেন নক্ষত্রালোকে, কেননা 'নিশা অত্যন্ত অন্ধকার।' সঙ্গের মানুষটি নির্বাক। জনশূন্য প্রান্তরে ভীতা বিমলা সাহস সঞ্চয়ের জন্য কথোপকথন শুরু করে, একসময় গজপতিকে জিজ্ঞাসা করে,

> "রসিকরাজ! তুমি গাইতে জান?"
> রসিকপুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু? দিগ্‌গজ বলিলেন,
> "জানি বৈ কি।"
> বিমলা বলিলেন, "একটি গীত গাও দেখি।"
> দিগ্‌গজ আরম্ভ করিলেন,
> "এ হুম্ - উ হুম্-
> সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।"

পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া

বেগে পলায়ন করিল।

রসিকের গীত চলিতে লাগিল।

"সেইদিন পুড়িল কপাল মোর—

কালি দিলাম কুলে।

মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী কথা কয় হাসি হাসি;

বলে, ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে যে উল্লেখ করেছেন "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত" — তারই ফলে গজপতি নির্দ্বিধায় গান গেয়ে উঠেছিল হয়ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথার অনুসরণেই বলতে হয় আবারও : "গীতে তাল যেরূপ মাত্রার সমতামাত্র — শব্দ প্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ "বেসুর" অর্থাৎ গণ্ডগোলমাত্র।" আর সেই গণ্ডগোলের আশঙ্কাতেই সন্ত্রস্ত গাভীটি "বেগে পলায়ন" করেছিল।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই এই অসম শব্দপ্রকম্পের বেসুর শুনিয়েই তাঁর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবেন না। আমরা তাই দেখছি "হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল; অমৃতময়, মানসোন্মাদকর, অপ্সরাহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নিস্তব্ধ প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তস্বর পরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।

দিগ্‌গজ নিশ্বাস রহিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন বিমলা সমাপ্ত করিলেন, তখন গজপতি কহিলেন, "আবার।

বি। আবার কি?

দি। আবার একটি গাও।

বি। কি গায়িব?

দি। একটি বাঙলা গান।

"গায়িতেছি" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।"

সঙ্গীতে আছে এই সম্মোহনী শক্তি। নিস্তব্ধ রাত্রে অসীম প্রান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সুরের অনুরণন। বিমলা সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি ওস্তাদী গানই প্রথমে গেয়েছিলেন। কিন্তু ওস্তাদী গানের সঙ্গে হয়ত তেমন পরিচয় না থাকায় দিগ্‌গজ "বাঙলা" গান শুনতে চেয়েছে। কেন? কারণ সম্ভবত বাঙলা গানে, ওস্তাদী গানের চেয়ে, বাণীর আকর্ষণ অনেক বেশি এবং বাণীর অঙ্গে অঙ্গে সুরের পরশ লেগে শ্রোতাকে এক অনাস্বাদিত আনন্দের জগতে নিয়ে যায় যা শিক্ষা ব্যতিরেকে ওস্তাদী গান দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্যই ওই নিরাবিল আনন্দ উপভোগ করার জন্য "শুনিবার প্রতিভা" থাকা চাই, শুধু "শুনাইবার নয়।" বিমলার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে যে দিগ্‌গজ মুগ্ধ হয়েছিল, সেই স্বরেই মুগ্ধ হয়েছিল কতলুখাঁ : " ও কি ধ্বনি? এ কে গায়? এ কি মানুষের গান, না, সুররমণী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের

সহিত গায়িতেছে।" অবশ্য কতলু খাঁর শোনা গান কিন্তু 'বাঙলা' গান ছিল না, অবশ্যই ঠুম্‌রী, গজল বা ওই ধরনের কোন মনোমোহিনী সুর ছিল।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সমুদ্রতটে "জনহীন তীরে কাপালিকের আচরণে সন্দিগ্ধ অসহায় নবকুমার অকস্মাৎ এক তরুণীর কণ্ঠস্বরে শুনলেন : "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" মুহূর্তমধ্যে নবকুমারের হৃদয়বীণার "তন্ত্রীচয়" একটি শব্দে, একটি "রমণীকণ্ঠসম্ভূত" স্বরে "সুখময় সঙ্গীত প্রবাহ" অনুভব করলেন। সামান্য চারটি শব্দের ধ্বনি "হর্ষকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্র মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।" কপালকুণ্ডলার উচ্চারিত শব্দপ্রকম্পে সুর জন্মেছে, কারণ সেখানে অবশ্যই ছিল মাত্রার সমতা। শুধু শব্দ হলেই হবে না, তাতে সমতা থাকলে তবেই সুরের জন্ম। তাই কপালকুণ্ডলার সামান্য কয়েকটি কথাও সঙ্গীতের সুরের মত নবকুমারের হৃদয়বীণায় আঘাত করেছে। একথাও ঠিক যে, এই স্বরধ্বনি নবকুমারকে হয়ত ভবিষ্যত আশঙ্কার মধ্যেও অনেকখানিই স্বস্তি বা নিরাপত্তা দিয়েছে।

মতিবিবি ওরফে লুৎফ-উন্নিসা — ওমরাহকন্যা — পারিবারিক রীতি অনুসারে পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেহেরউন্নিসাও নৃত্য-গীতে অদ্বিতীয়া ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : "সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা সীমা আছে।...যে কথা সহজে বলিলে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়।" "মৃণালিনী" উপন্যাসে গানের ব্যবহার প্রসঙ্গে এই কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। উক্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের "তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভিখারিণী"-তে মৃণালিনী-মণিমালিনী—দুই সখীর মধ্যে যখন হেমচন্দ্র বৃত্তান্ত আলোচিত হচ্ছিল তখন "কোমলকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত" শোনা গেল কোন এক ভিখারিণীর কণ্ঠে—

মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি,
শ্যামবিলাসিনী রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী - রে।

এ গানে ভিখারিণী যেন মৃণালিনীর মনের কথাকেই ব্যক্ত করেছে। আর মৃণালিনী সেই অন্তর্গূঢ় ভাবনাটির সঙ্গে গানের সাযুজ্য পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ভিখারিণীর গানে শ্যামসুন্দর দেশে দেশে ফিরে প্রেমিকার সন্ধান করছেন, অন্তরে তাঁর "বহুত পিয়াসা", কিন্তু "না মিটল আশা রে।" যে রাত্রে হেমচন্দ্রের অঙ্গুরীয় সংকেতে দূতীর সঙ্গে তীরে বাঁধা নৌকার কাছে এসে মাধবাচার্যের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল মৃণালিনী, ভিখারিনীর গান যেন সেই রাত্রির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে :

সা নিশা সমরি, কহলো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা-রে।
শুনি, যাওরে চলি, বাজয়ে মুরলী, বনে বনে একা-রে।

এই গান মৃণালিনীর কাছে হেমচন্দ্রের সংকেত পুনর্বার বহন করে এনেছে। এখানে পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্বপরিস্ফুটনে সঙ্গীত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মৃণালিনী প্রশ্ন করে জেনেছে যে, এ গানের রচয়িতার কথার ব্যবসা, ভিখারিণী তার "নগ্‌দামুটে।" ভিখারিণী গেয়েছে :

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ।।
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সো হি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি।।

মৃণালিনী তার উত্তর দিয়েছে গানেই,

কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।।

গানটি দীর্ঘ হওয়ার কারণে সবটা উদ্ধৃত করা গেল না। আগ্রহী পাঠক উপন্যাসের ওই অংশবিশেষ সন্ধান করে নিতে পারেন। হেমচন্দ্রের কাছে সঠিক উপস্থাপনের জন্য মৃণালিনী ভিখারিণীকে শুধু গানটুকুই শেখায় নি, "চক্ষের জলটুকু" শুদ্ধ শিখিয়েছে। ভিখারিণীর সঙ্গে মৃণালিনীর কানে কানে কথা সম্পর্কে মণিমালিনী কৌতূহলী হলে মৃণালিনী প্রফুল্লচিত্তে গান গেয়ে উত্তর দিয়েছে :

কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি ব'লে দিলি ওই।।
সই ফিরে ক'না সই, সই ফিরে ক'না সই।
সই কথা কোস্‌ কথা কব, নইলে কারো নই।

গানকে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ঘটনার ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রেম বোঝাতে কীর্তন ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃত গানটিতে "সই", "কানে কানে", 'ক'না", "কথা" প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্ব ব্যবহারে অনুপ্রাসের ছোঁয়া লেগেছে। ভিখারিণী তথা গিরিজায়ার গানের মধ্য দিয়েই হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সন্ধান পেয়েছেন, তাকে পত্র পাঠিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু মৃণালিনীর ধৈর্য বাঁধ মানে না। গিরিজায়া তাকে পরামর্শ দিয়েছে নবদ্বীপে যেতে। কিন্তু কি প্রকারে যাওয়া যাবে? সম্পূর্ণ একা? গিরিজায়া গানেই তাকে জানিয়েছে :

মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয়রে।।
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে।।

সমগ্র উপন্যাসটি যেন গানের ঝরণাধারায় সিঞ্চিত হয়েছে এবং মাধুর্য বৃদ্ধি করেছে। গান দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের অনেক জটিলতার সমাধান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে এভাবে বাংলা গানকে ব্যবহার করতে সম্ভবত আমরা আর কাউকে দেখি নি।

সাহিত্যে গানের ব্যবহার মধুসূদনও করেছিলেন এবং সেগুলি স্বরচিত। কিন্তু প্রচলিত গীতসম্ভার থেকে বাংলার প্রাণের গানকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শিষ্ট সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগিতা দিলেন। সেদিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের সুবিশাল জমিদার বাড়ির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন : "কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোর বয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে।" সেকালে জমিদার বাড়ির বিস্তীর্ণ পরিসরে নানা মানুষের নানা কাজকর্মের মধ্যে নিত্যদিন গান-বাজনা হওয়াও জমিদারী দস্তুরের মধ্যেই পড়ত।

উপন্যাসের "নবম পরিচ্ছেদ : হরিদাসী বৈষ্ণবী।"—অংশে নারীদের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে এক বৈষ্ণবী — "রমণীকুলদুর্ল্লভ"। কিন্তু "বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ সকলও পৌরুষ।" সমবেত নারীদের গান শুনিয়েছে বৈষ্ণবী। কি গান? "শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন।..... দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না। "একটি অস্ফুটবাচ্য বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি।" বঙ্কিমচন্দ্র সেকাল প্রচলিত গানের উল্লেখ করেছেন, আবার বয়সানুসারে এক এক রমণীর ভিন্ন ভিন্ন রসাস্বাদনের ইচ্ছাটিকেও চমৎকার ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীনার রুচির সঙ্গে যুবতী নারীর রুচির যে আশমান-জমিন ফারাক্—তা এই বর্ণনাটি থেকে বেশ স্পষ্ট হয়।

বৈষ্ণবী সকলের ইচ্ছাই শুনল, কিন্তু লজ্জাবনত কুন্দের কোন ইচ্ছা জানতে পারল না। অবশেষে তার ইচ্ছা জেনে বৈষ্ণবী গাইল কীর্তন। আসলে বৈষ্ণবীর প্রকৃত লক্ষ্যই ত কুন্দনন্দিনী : "হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্ত প্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল — যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যা-বিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিত চিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্ব্বাঙ্গীন তাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য

নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিতা এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।" বোদ্ধা বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবীর গায়নপদ্ধতির এমন সুচারু বর্ণনা দিতে পেরেছেন। তাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান যে কেবল সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই গাওয়া চলে না, তার জন্য চাই যথাবিধি শিক্ষা ও অনুশীলন তা বঙ্কিমচন্দ্র বিলক্ষণ জানতেন। প্রসঙ্গত, শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে জানতে পারি : "বঙ্কিমচন্দ্রের সুকণ্ঠ ছিল না, কিন্তু তাঁহার তান-লয়বোধ অনন্যসাধারণ ছিল।" স্মরণ করা যাক্ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মন্তব্যটি : "গীতের পারিপাট্যের জন্য আবশ্যক দুইটি — স্বরচাতুর্য্য এবং শিল্প চাতুর্য্য।" সেই স্বরচাতুর্য ও শিল্পচাতুর্যকে একসঙ্গে কার্যকরী করে সকলের অনুরোধে বৈষ্ণবী "সতৃষ্ণ বিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল;

শ্রী মুখপঙ্কজ — দেখ্‌বো বলেহে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।'
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।"...ইত্যাদি

হরিদাসী বৈষ্ণবী সূর্যমুখীকে শ্যামাবিষয় গানও শুনিয়েছে। আসলে সে আগেই জানিয়েছে যে, সে জাতবৈষ্ণবী নয়। তাই সে খঞ্জনীতে খেমটা বাজিয়ে গানও গেয়েছে

আয়রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা করে
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা।

খেমটা গানও বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন নিঃসঙ্কোচে। অল্পবয়সী কয়েকটি মেয়ে বৈষ্ণবীকে নিধুবাবুর টপ্পা গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। নিধুবাবুর টপ্পা মূলত আদিরসাত্মক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারের গুণে তার চমৎকারিত্ব ধরা পড়ে।

'বিষবৃক্ষ'-এর "পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : হীরা"-তে হরিদাসী বৈষ্ণবীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসাত্মক গান দিয়েছেন —

কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কাণে পরলেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।
মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে
নবীন মুকুল।"

বৈষ্ণবীর এই গান শুনে সূর্যমুখীর সন্দেহ জেগেছে। এই গান যে গৃহস্থ বাড়ির গান নয় তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন সূর্যমুখী। আমরা জেনেছি, গানটি হরিদাসী বৈষ্ণবী ওরফে

দেবেন্দ্রের কুন্দসম্পর্কে মনোভাবজ্ঞাপক গান।

"সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : যোগ্য; যোগ্যেন যোজয়েৎ" অংশে সুরেন্দ্র-দেবেন্দ্রের কথোপকথন সময়ে রুষ্ট সুরেন্দ্র উঠে গেলে দেবেন্দ্র "শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন,

আমার নাম হীরামালিনী
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে—কুব্জা আমার ননদিনী।"

গানটি অবশ্যই রুচিকর নয়,.তবে দেবেন্দ্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই বলে ব্যবহৃত। অতিরিক্ত মদ্যপানে বাহ্যজ্ঞানরহিতপ্রায় দেবেন্দ্র "ঝিম্‌কিনি মারিয়া" গেয়ে উঠেছে—

বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখতে শুনতে কালো কোলো,
পিলে অগ্রমাসে মোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ে।

তবে দেবেন্দ্র সঙ্গীতে পারদর্শী ছিল। তার মধুর স্বরে "মধুর পদ মধুরভাবে" গাওয়াতেই হীরার মনে হয়েছিল : "সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী — আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুইজনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী।" সঙ্গীতের দ্বারা যথার্থ রসিকের এমনই আত্মবিস্মৃতি ঘটতে পারে। কল্পনাও তখন সত্যের আকার নেয়।

মাতামহীর দাসীবৃত্তি বংশপরম্পরায় পরিচারিকা হীরার—কায়স্থকন্যা হীরার কাছে এসেছে। বয়স 'বিংশতি বৎসর', অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠ, তবে বুদ্ধিমতী। হীরা বালবিধবা, অত্যন্ত মুখরা, কেশ ও বেশবিন্যাস সধবার মত; উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা, মুখখানি যেন মেঘাবৃত চন্দ্রিমা, চুলগুলি সাপের ফণার মত দোদুল্যমান। এমন রঙ্গময়ী রসিকা মালতী মারফত দেবেন্দ্রের ডাক পেয়ে গেয়ে উঠেছে—

মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়।।

হীরার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় দেবেন্দ্র বিদ্রূপ করে গেয়েছে

এসেছিল বক্‌না গোরু পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে—

এসব ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব প্রকাশের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে গান। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় "মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়।" এসব গানকে এভাবেই দেখা চলে।

বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের অবস্থা ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা সংস্কৃত শ্লোক, স্তোত্র প্রভৃতিও ব্যবহার করেছেন। উন্মাদ হীরার মুখে যখন তখন "স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং / দেহি পদপল্লবমুদারং।"—একদিকে নিরপরাধ কুন্দের মৃত্যু, অপর দিকে হীরার উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় 'গীতগোবিন্দের' এই শ্লোকটি 'বিষবৃক্ষ'-এর সমাপ্তিকে করে তুলেছে যেমন করুণ তেমনি বিষণ্ণ-গম্ভীর।

'ইন্দিরা'তে গানের ব্যবহার খুব বেশি নেই। "পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাজিয়ে যাব মল"

অংশে প্রথম গঙ্গা-দর্শনে ইন্দিরার "আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল।" গঙ্গায় নানা রমণীর কলসে জল ভরা, জল ফেলা, হাসি, গল্প দেখে প্রাচীন একটি গান তাঁর মনে পড়ল —

একা কাঁকে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়।

এই গান স্বামী-বিরহিনী ইন্দিরার অন্তর্ব্যথারই প্রকাশ। এই অবস্থায়ই অমলা আর নির্মলা নামে ৭/৮ বছরের দুটি বালিকার কণ্ঠে ইন্দিরা 'জোয়ারের জলের গান' শুনেছে — "একজন একপদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়।" গানটি এইরকম—

অমলা

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল।।

নির্ম্মলা

ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই জল আনিগে,
জল আনিগে চল।।

গানটিতে "আয় আয় সই, জল আনিগে, / জল আনিগে চল" অংশটি ধ্রুবপদের মত বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে। "জোয়ারের জলের গান" কিম্বা "মল বাজানর গান" যাই হোক-না-কেন, এমনতর গান "ষোল বছরের মেয়ের মুখে ভাল শুনাইত না বটে, সাত বছরের মেয়ের মুখে বেশ শুনায়। জোয়ান মিন্‌সের হাতের চড়চাপড় জিনিস ভাল নহে বটে, কিন্তু তিন বছরের ছেলের হাতের চড়চাপড় বড় মিষ্ট।" গানটি ইন্দিরার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি করেছে যে, একই বিষয় কেন দুইক্ষেত্রে দুইরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? "সত্য সত্যই কেহ স্ত্রীকে বনে দিয়া আসিলে লোকে তাহাকে মহাপাপী বলে; কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে বনে দিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ মহাপাপী বলে না কেন?

ঠিক করিলাম, অবস্থাভেদে এ সকল হয়। কথাটা আমার মনে রহিল। আমি ইহার পর একদিন যে নির্লজ্জ কাজের কথা বলিব, তাহা এই কথা মনে করিয়া করিয়াছিলাম। তাই এ গানটা এখানে লিখিলাম।"

তবে গানটি যে ইন্দিরার ভাল লেগেছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ — "বালিকা সিঞ্চিত রসে, এ জীবন শীতল হইল। সকলেরই ত একই জিনিষ ভাল লাগে না, তাই বসুজমহাশয়ের সহধর্ম্মিনী বলিলেন — ও ছাই গান আবার হাঁ করিয়া শুনচ কেন? ....ছুঁড়ীদের মরণ আর কি? মল বাজানর আবার গান।"

"অষ্টম পরিচ্ছেদঃ বিবি পাণ্ডব" অংশে সুভাষিণীর পাঁচ বছরের মেয়ের মুখে আর

একটি গান শোনা গেল, সেটিকেও পূর্বেরটির মত লোকগীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। ইন্দিরার হাতের রান্না কেমন হয়েছে সেকথা বলতে গিয়ে "বেশ! বেশ গো বেশ!"—কথাটির সূত্রে গানটি এসে পড়েছে—

রাঁধ বেশ বাঁধ কেশ
বকুল ফুলের মালা।
রাঙ্গা সাড়ী হাতে হাঁড়ী
বাঁধছে গোয়ালার বালা।।
এমন সময়, বাজল বাঁশী,
কদম্বের তলে।
কাঁদিয়ে ছেলে, রান্না ফেলে,
রাঁধুনি ছোটে জলে।।

এটি একটি মেয়েলি ছড়ার গানও বলা যেতে পারে। শোণের নুড়ির চুল বলে বামন ঠাকরুণকে ছেলেরা ক্ষ্যাপায় শুনে সুভাষিণীর পাঁচ বছরের মেয়ে গেয়ে উঠেছে —

চলে বুড়ী শোণের নুড়ী
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি গলায় দড়ী
কাণে জোড়া দুল।
যম বলেছে সোণার চাঁদ
এসো আমার ঘরে।
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।
যে ডাকে যমে।
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই বুড়ে মরে যা না ভাই।

আশ্চর্য মনে হতে পারে যে, মাত্র পাঁচ বছরের একটি মেয়ের এতটা তাৎক্ষণিক রসিকতার বোধ কেমন করে থাকতে পারে? একটু সংশয় থাকলেও উত্তরে বলা যায় যে, এইসব রসিকতা খেলার সাথী, বাড়ির প্রতিবেশী পরিজনদের কাছ থেকে অনবরত শুনে শুনে ছোটরা আনন্দে মুখস্থ করে নেয় এবং জায়গামত ছুঁড়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছেলে ভুলানো ছড়া"[১] তে বলেছিলেন : "আঁটঘাটবাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয় — যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে জায়গাবিশেষে যখন ছড়াগুলি ব্যবহার করেন তখন একবারও বেমানান ত মনেই হয় না, বরং যথাস্থানে ব্যবহারের সুকৌশলে সে সব স্থানের সরসতা বৃদ্ধি পায়, রসিক বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা মেলে। এসব ছড়ায় বক্তব্যের বাঁধুনি যে তেমন রক্ষিত হয় না তা রবীন্দ্রনাথও

বলেছেন : "বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ।....মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।....বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না।"

"একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ : সেকালে যেমন ছিল" অংশে ইন্দিরা-উ-বাবুকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম্য হাসি-ঠাট্টা, গান-রসিকতায় জমাট "মেয়েদের মজলিস"-এর ছবি এঁকেছেন। ইন্দিরাকে চিনতে পারা না-পারা নিয়ে কথাবার্ত্তার সূত্রে রসিকা কামিনী যাত্রার গান গেয়ে উঠেছে —

'ধবলী বলিল শ্যাম কে চেনে তোমারে।
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে।।
পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কাণে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি তা জানে?'

মেয়েদের এই মজলিসে সুন্দরী মহিলারা উ-বাবুকে ধরেছে : "তোমাকে গায়িতে হইবে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি সনদী খিয়াল গাহিলেন। শুনিয়া সে অপ্সরোমণ্ডলী হাসিল। ফরমায়েস করিল, "বদন অধিকারী, কি দাশুরায়।" তাতে উ-বাবু অপটু।" সে যুগের শিক্ষিত পুরুষসমাজে সংস্কৃতির চর্চা বদন অধিকারী কিম্বা দাশুরায়কে দিয়ে তেমন হ'ত না; সেখানে মার্গ সঙ্গীতের যে চল ছিল, তা বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে দিয়েছেন। মজলিসের কথোপকথন থেকে পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যকেই আমরা স্মরণ করতে পারি : "উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না।" অন্দরমহলের সংস্কৃতিচর্চা তখনও খুব উচ্চাঙ্গের হয়ে ওঠে নি, শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিচর্চার সম্বন্ধ ওতপ্রোত আর সেকারণেই অন্তঃপুরিকারা কিছু রঙ্গ-তামাসাপূর্ণ আদিরসাত্মক গানেই আসর জমাতে চেয়েছিল।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দলনী বেগম — মীরকাসেম যাকে ডাকেন 'দলনী' — নবাবের জন্য অপেক্ষমানা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী মনের অধীরতাকে শান্ত করার জন্য "এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল, এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, গীত আরম্ভ করিল — যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গায়িতেছে।" নবাবের অনুরোধে গাইবার চেষ্টা করলেও "মহা গোলযোগ বাধিল।...বীণার তার অবাধ্য হইল — কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরো বলিতে লাগিল,....। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" কিন্তু নবাবের সাক্ষাতে দলনীর কণ্ঠে সুর "কিছুতেই ফুটিল না।" অবশেষে সে নবাবকে অনুরোধ করেছে : "কলিকাতার ইংরেজরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।" মুসলিম নবাবদের অন্তিম দশায় ইংরেজদের অধিকার বিস্তার এবং জনচিত্তে তাদের প্রভাবের বিষয়টি এই অংশ থেকে বেশ বোঝা যায়। দলনী-মুসলিমকন্যা। শুধু গীতরসিকাই নয়, নানা বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শিনীও, সে বীণা বাজাতে পারে, বেহালাও। ইংরেজদের বাজনা নিশ্চয়ই সে বাজাতে জানে না, তবে সুরজ্ঞান সম্পন্না দেশী বাদ্যযন্ত্রে পারঙ্গমা দলনীর পক্ষে তা শিখে নেওয়া তেমন

কষ্টসাধ্য নয়। বঙ্গদর্শন-এর 'সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল : "মুসলমানদিগের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকৃত হইলে তাহারা এদেশে বসতি করে। মুসলমানের আগমনে ভারতবর্ষের অনেক লাভ হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়েও তাহা দেখা যায়।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে এবং সঙ্গীত শাস্ত্র আদ্যোপান্ত গ্রহণপূর্ব্বক নানা উন্নতিসাধন করিয়াছে। অর্থব্যয় ও উৎসাহের দ্বারা সঙ্গীত অনুশীলন প্রবল রাখিয়াছিল, এবং যত্নের দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছে। আশ্চর্য এই যে, প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত প্রণালী কোন অংশেই ভিন্নজাতি সংসর্গে অপভ্রংশ প্রাপ্ত হয় নাই। স্বভাবেই রহিয়াছে। আরবী তুর্কী প্রভৃতি বিদেশীয় গীত প্রথা ভারতবর্ষে নাই। আমাদের গীতি রীতি মাত্রেই দেশীয়। আমীর খসরুর দ্বারা আটটি দেশী গীতে বিদেশী ভাগ কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়া সরফরদা, দেওগিরি প্রভৃতি আটটি রাগিণী প্রস্তুত হয়। কিন্তু দেশীয়ের ভাগ এই সকল রাগিণীতে এত প্রবল যে, সে সকলকে বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। বোধ হয় যে, দেশীয় সঙ্গীতপ্রথা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিদেশীয় গীত প্রথা তাহার বিকৃতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

মুসলমানদিগের দ্বারা বাদ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। সেতার এসরাজ সারঙ্গ ইত্যাদি সকল যন্ত্র নব্য। গীতেরও অনেক উপকার দেখা যায়। ধ্রুপদ ব্যতীত খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ইত্যাদি মুসলমানদের প্রযত্নে প্রকাশ হইয়াছে, রাগরাগিণী অনেক বাড়িয়াছে, এবং তালের নূতন পদ্ধতি ও তাহার চমৎকার পারিপাট্য ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।"

মুসলমানী আমলে যে গীতবাদ্যের যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল তা এই অংশ থেকে জানা যাচ্ছে। এ ছাড়া, দলনী যে ইংরেজদের বাজনা বাজিয়ে গান গাইতে চেয়েছে সে বিষয়েও উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে : "আমাদের বাদ্যযন্ত্র সকল, আমাদের গীতের উপযোগী সত্য বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োগ কষ্টসাধ্য। আমাদের অনেক বাদ্যের ধ্বনি উৎকৃষ্ট বলিয়া কোনমতেই গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বাদ্যের মধ্যে কোন যন্ত্রের শব্দই ইউরোপীয় যন্ত্রের শব্দের সমকক্ষ নহে। এজন্য এদেশীয় হার্ম্মোনিয়ম প্রস্তুত করা আবশ্যক।"

ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র যে ধ্বনির দিক দিয়ে দেশীয় কোন কোন বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎকৃষ্ট তা স্বীকার করাই হয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ প্রবন্ধখণ্ড প্রথম অংশ — পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি সংস্করণে এই প্রবন্ধটি শুরুর পূর্বে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, 'সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়, কিছু অংশ রচনা করেছিলেন জগদীশনাথ রায়। সেকারণে পূর্বোদ্ধৃত সমস্ত উক্তিগুলিই যে বঙ্কিমচন্দ্রের, এমন নয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার কারণে এবং একই প্রবন্ধের অংশবিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের হওয়ার কারণে অলিখিত অংশগুলিও তাঁর গোচরীভূত ছিল এবং সমর্থনও ছিল বলে ধরে নেওয়া হ'ল।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের "দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভীমা পুষ্করিণী"তে শৈবলিনী ও সুন্দরী "ধাতুকলসীহস্তে" জলক্রীড়া করতে করতে শৈবলিনী গান গেয়েছে —

ঘরে যাব না লো সই।
আমার মদনমোহন আসছে ওই।
হায়! যাব না লো সই।

এ গানও ভবিষ্যত ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। দলনী বীণা-বেহালা বাজিয়ে যে গান গাইবার চেষ্টা করেছে তা নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত। কিন্তু হিন্দুরমণী শৈবলিনী "গোপনে রসিকতা করে দু'কলি গেয়ে উঠেছে। কিন্তু সুন্দরীর "দূর হ! পাপ! ঘরে চ" মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, গৃহস্থ ভদ্র ঘরের মেয়ে শৈবলিনীর গান গাওয়াটাকে সে মোটেই সুনজরে দেখেনি। বঙ্কিমচন্দ্র 'সঙ্গীত' প্রবন্ধেই বলেছিলেন : "বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌর কন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন।" তবু বঙ্কিমচন্দ্রকে সে যুগের রীতি বা প্রথাটুকু মানতেই হয়েছিল বলে আর অতিরিক্ত গান সচেতন শৈবলিনীর মুখে তিনি দেন নি।

পরের গানটি চতুর্থ খণ্ডের "চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৌকা ডুবিল" অংশে গুহাভ্যন্তরে বাহ্যজ্ঞানরহিত পূর্বস্মৃতিবিস্মৃতা শৈবলিনী আপনমনে গেয়েছে—

কি করিলে প্রাণসখী, মন চোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পিরীতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে।

এই 'মনচোর' কে? যদিও অপ্রকৃতিস্থা শৈবলিনী বলেছে, সে চন্দ্রশেখর, কিন্তু তার একটু আগেই আবার বলেছে : " শৈবলিনী কে? রসো রসো। একটি মেয়ে ছিল তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল তার নাম প্রতাপ।একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" তবে আসল 'মনচোর' কে? প্রতাপ? পিরীতি নদীর দুই কূল কি চন্দ্রশেখর আর প্রতাপ? শৈবলিনী কোন্ মনচোরকে ধরেছে? শৈবলিনীর মনের হাহাকার যেন খান্ খান্ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিগবিদিকে। ক্ষণিক চেতনপ্রাপ্ত শৈবলিনী "চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল— ...কত কাঁদিল — তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

ক্ষণিকের জন্য চন্দ্রশেখরকে চিনতে পারলেও "পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আবার বেদগ্রামে' অপ্রকৃতিস্থা শৈবলিনীকেই আবার দেখি। সুন্দরীকে দেখে পার্বতী বলে ভুল ক'রে শৈবলিনী তাকে একটা গান গাইবার জন্য অনুরোধ ক'রে নিজেই গেয়ে উঠেছে —

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি ফাঁদ।

শৈবলিনী এখনও আত্মবিস্মৃত। ওপরের গানটি যত সহজে শৈবলিনীর বিরহ-যন্ত্রণাকে স্পষ্ট করতে পেরেছে তা নিছক সংলাপে সম্ভব হ'ত না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : "গীতের দ্বারা প্রেম ও শোকাদির প্রগাঢ় রূপ অভিব্যক্তি অবশ্যই সম্ভাব্য।" ১২৮০-র কার্ত্তিক বঙ্গ

দর্শন-এ 'যাত্রা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত 'নৃত্য' রচনায় বলা হয়েছিল : "মনের অনেক প্রকার যন্ত্রণা বাক্যে প্রকাশ হয় না, তাহা কেবল সুরে প্রকাশ হয়। দুঃখ যত গভীর ততই বাক্যের অতীত। ব্যথিত অন্তঃকরণ মধ্যে কিরূপ তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, বাক্যে তাহা দেখিতে পায় না; দেখিতে পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্য অন্ধ, বাক্য অসম্পূর্ণ। এই জন্য যে গ্রন্থকর্ত্তা কেবল ব্যথিত ব্যক্তিকে কথকগুলা কথা বলিয়াই তাহার গভীর মর্মপীড়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই নিষ্ফল হইয়াছেন।" বাক্য অনেক সময় বাহ্যিক, কিন্তু সুর সবসময়েই আন্তরিক। তাই এইসব ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সংলাপের পরিবর্তে গানের মধ্য দিয়েই মানসিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন চমৎকারভাবে। শৈবলিনী যখন কিছু ভাবতে চায়, ভাবনা হয় অসংলগ্ন : "কে যেন নেই — কে যেন ছিল, সে যেন নেই — কে যেন আসবে, সে যেন আসে না — কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই ....." ইত্যাদি। এই অসংলগ্নতাকে গান অনেকখানি সংহতি দিতে পারে বলে বঙ্কিমচন্দ্র নানান্ পরিস্থিতিতে গানের ব্যবহার করেন।

পঞ্চম খণ্ডের "তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নৃত্যগীত" অংশে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ ও মাহতাবচন্দ জগৎশেঠের বিশাল অট্টালিকায় বসেছে নাচগানের মজ্‌লিস। স্বর্ণমুক্তাখচিত চতুর্দিকে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে বহুমূল্য রত্নাবলীর ঔজ্জ্বল্য—আর তারই সঙ্গে "দীপরশ্মি নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল।" এর মধ্যে মনিয়া বাই বসে সনদী খেয়াল গাইছিল : "শিখে হো ছল ভালা।" বাইজি কেদার, হাম্বীর, ছায়ানট একে একে গাইতে লাগল। এখানে গানকে শলা-পরামর্শের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বাহ্যিক আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে : "নৃত্যগীত উপলক্ষ মাত্র। জগৎশেঠরা বা গুরগণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যাহা করে তাঁহারাও তাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়।"

'রাধারাণী'-তে বঙ্কিমচন্দ্র গান ব্যবহার করেন নি। 'রজনী'-তে অন্ধ ফুলওয়ালী রজনীর "জীবন অন্ধকার।" রজনী আশৈশব মালা গাঁথে। মালা গাঁথতে গাঁথতে তার মনে গান আসত, কিন্তু পিতার উপস্থিতিতে সে কোনদিন গান গায় নি : "পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম — আমার এত সাধের প্রভাতে সই ফুটলো নাকো কলি — ...।" গানের কলিটির মধ্যে রজনীর মনোবেদনার প্রকাশ আছে। তারই সঙ্গে আরো জানা যায় যে, সে যুগে ভদ্রঘরের মেয়েদের পুরুষের সামনে গান-গাওয়া রীতিমত নিন্দার্হ ছিল, কারণ গান-বাজনার চল ছিল তখন জমিদার-বাবু-সম্প্রদায়ের মধ্যে আর মনোরঞ্জন করত বাঈজীরা। 'চন্দ্রশেখর'-এও বেগম এবং বাঈজীদেরই গান গাইতে দেখা গেছে। সে গানও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

তৃতীয় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী শচীন্দ্র তার পিতার আনীত এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কেন তিনি বেদগান করেন? বহু তর্কের পর স্থির হয় যে, কোকিলের যেমন গান গেয়েই সুখ তেমন সন্ন্যাসীরও বক্তব্য "গাইয়াই আমার সুখ।" কিন্তু শচীন্দ্র ছাড়বার পাত্র নয়। এরপরও তার প্রশ্ন, গাইতেই যদি হয় তবে টপ্পা, খেয়াল ইত্যাদি নয় কেন? তাতে সন্ন্যাসী বলেছেন: "কোন্ কথাগুলি সুখকর—সামান্যা

গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর? ....মন আত্মার অনুরাগী নহে। আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত, বেদগানই প্রাচীনতম সঙ্গীতের নিদর্শন এবং সেই গানে আত্মার হিতসাধন হয়, আত্মাকে বশীভূত করা যায়, বহির্মুখী চিত্ত অন্তর্মুখী হয়। পক্ষান্তরে টপ্পা, খেয়াল, ঠুমরি প্রভৃতি গণিকাদের গান, তা চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে রোহিণীসহ গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের কুঠিবাড়িতে অবস্থান। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েই দিয়েছেন : "এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল।" এখন গোবিন্দলাল সেই নীলকুঠিতে রোহিণীকে নিয়ে। রোহিণী এক মুসলমান সঙ্গীতশিক্ষকের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে — "কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র —....সুরুচিবিগর্হিত —অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে — কাছে বসিয়া যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে — সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে।" এরপর বঙ্কিমচন্দ্র যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে ওস্তাদী গান সম্পর্কে তাঁর অসহিষ্ণুতার পরিচয় আছে। সেখানে গায়কের মুখভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের মত ওস্তাদীগানের শ্রোতাকেও বিরূপ করে তুলেছে :

"তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান খ্যান ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল — তখন তিনি সেই গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমলকণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল — তাহাতে সরু মোটা আওয়াজ, সোনালি-রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।"

এইসব বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, জমিদার গোবিন্দলাল সেকালীন জমিদারী অভ্যাস অনুযায়ী প্রসাদপুরে রোহিণীকে দিয়ে বাঈজীর সাধ মেটাতে চাইছিলেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।" এই " নিতান্ত না বলিলে নয়" বলতে গিয়েই ওস্তাদজীর গায়নভঙ্গীর বর্ণনা এসেছে, যা অদর্শনীয় তাকেই দিয়ে যেন ছবির মত করে দেখিয়েছেন। তানপুরার তারের "মেও মেও" আর তবলার "খ্যান্ খ্যান" শব্দ দুটির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের অরুচিকরতা ও অসহিষ্ণুতার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ "সংগীতের মুক্তি" রচনায় বলেছিলেন : "কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে,

সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশেল বাড়তেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। এইজন্যে ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছেড়ে অসুরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে। সেখানে তাল-মান-লয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হয়ে ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে।

... ...

গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগবিলাস হয়, তবে তাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে।" সেই নির্জীবতাই বঙ্কিমচন্দ্র ওস্তাদজীর গানে অনুভব করেছিলেন।

নিশাকরের মুখে ভ্রমরের নাম শুনে গোবিন্দলালের পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয়েছে। ভ্রমর নিশাকরকে তার বিষয়-সম্পত্তির পত্তনি দিতে চায়, কিন্তু অবশ্যই গোবিন্দলালের অনুমতি সাপেক্ষে। ভ্রমরের নাম শুনেই গোবিন্দলাল "বড় অন্যমনস্ক। ...তাঁহার সেই ভ্রমর !! প্রায় দুই বৎসর হইল।" নিশাকরকে বিদায় দিয়ে অন্যমনস্ক গোবিন্দলাল দানেশ খাঁ-কে বললেন "কিছু গাও।" এখন আর পছন্দের বা ভাললাগার গান নয় বা রাগরাগিণীও নয়, নিজেকে ভ্রমর-চিন্তায় ব্যাপৃত রাখতে গিয়ে বললেন "যা খুসি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। ...গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।" সবেতেই ব্যর্থ হয়ে "গোবিন্দলাল দ্বার রুদ্ধ করিয়া....খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।" মনে হয়, গোবিন্দলাল জমিদার বাড়ির রেওয়াজ অনুযায়ী অল্পবয়স থেকেই গীতবাদ্য শিক্ষা করেছিলেন। গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের বাড়ি জমিদারদের বাঈজী কালচার, বাগান-বাড়ির নেশা প্রভৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নিরপরাধ ভ্রমরের প্রতি যে অন্যায় ও নির্ম্মম আচরণ গোবিন্দলাল করেছিলেন তা-ই তাকে প্রতিমুহূর্তে অশান্তি দিয়েছে, কুরে কুরে খেয়েছে তার অন্তরকে। গোবিন্দলালের কান্না, আত্মবিস্মৃত হবার চেষ্টা তারই প্রতিক্রিয়া।

দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে—গোবিন্দলালের চোখ ফোটাবার জন্য এবং রোহিণীকে পাপীয়সী প্রমাণ করার জন্য নিশাকর পূর্ব পরিকল্পনামত ঘাটের ধারে গিয়ে বসেছে, এমন সময় "কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন.... মনে মনে ভাবিতেছেন," আমি কি নৃশংস!" শ্যামাবিষয়ক গান নিশাকরের চৈতন্যকে জাগ্রত করেছে, মনকে উদাস করে তুলেছে। ধীবরের গানের অন্তরনিঙড়ানো আবেদন ক্ষণিকের জন্য হলেও নিশাকরের মনকে বিষণ্ন করেছে, বিবেকদংশন অনুভব করেছে সে। মার্গ সঙ্গীত গোবিন্দলালকে শান্তি দিতে পারে নি, কিন্তু বাংলা শ্যামাবিষয়ক গান শ্রোতার অন্তরে গভীর অনভূতির সঞ্চার করতে পেরেছে। বাংলা গানের এই অপরিসীম শক্তির কথা বঙ্কিমচন্দ্র বার বার স্বীকার করেছেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ "চিত্রবিচারণ" অংশে বয়স্যা সখি নির্মলকুমারীর সঙ্গে কথাবার্তার সূত্রে জানা যায় যে, চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের

ছবিটির প্রতি অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া সহজ নয় জেনে চঞ্চলকুমারী নিজ মনের ভাবটি একটি পদে ব্যক্ত করেছেন :

গৌরী সম্‌ঝে ভসমভার,
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।।
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্‌ঝে বীরবালা।।......ইত্যাদি

এই পদেই আছে "বীর ভজন যুবতী মন্‌মে।" বঙ্কিমচন্দ্র বলে দিয়েছেন : "আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?"যথার্থই এই বয়স স্বপ্ন দেখার, আদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখার বয়স। আঠারো বছর বয়স সম্ভব-অসম্ভব বোঝে না, জানে শুধু স্বপ্ন দেখতে। মনে পড়ে যায় কবি সুকান্তর "আঠার বছর বয়স" কবিতাটির কথা। কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি এইরকম—

(ক) এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

(খ) আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স মানে না কাঁদা।

(গ) বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুনকিছু তো করে —

ফিরে যাই রাজসিংহ উপন্যাসের প্রসঙ্গে। আঠারো বছরের চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের ছবিতে পদাঘাত করেছেন জেনে তাকেই বিবাহ করার শপথ নেন নবাব। রূপনগর ত্যাগ করে চঞ্চলকুমারী চলেছেন শিবিকায়। বেদনা-জর্জরিতচিত্ত চঞ্চলকুমারী নির্মলকুমারীকে বলেছে "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।"শিবিকার অগ্রপশ্চাতে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনাসহ দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য চলেছে। তাদেরই মধ্যে একজন অগ্রবর্ত্তী গাইছিল :

শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি।
ন সম্‌ঝে গোপকুমারী,
যেহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি।।

গানটি চঞ্চলকুমারীরই উদ্দেশ্যে মাণিকলালের গাওয়া। পরিস্থিতি অনুযায়ী মাণিকলালের কণ্ঠে এই ভাষার গানই সমধিক উপযোগী। এই গানে রাজসিংহের স্মৃতিচারিণী অশ্রুপরায়ণা

চঞ্চলকুমারীকে বোঝান হয়েছে যে, তাঁর পথ চেয়েই তাঁর প্রেমিক রাজসিংহ অপেক্ষা করে রয়েছেন— "ন সম্‌ঝে গোপকুমারী, / যেহিন বৈঠত মুরারি, / বিহারত রাহ তুমারি।।"

নির্মলকুমারী রঙ্গিণী রসিকা বুদ্ধিমতী যুবতী। ঔরঙ্গজেবের মহলে তার বেজায় কদর। নির্মলকুমারীকে নানা প্রশ্ন করে ঔরঙ্গজেব অতি সুকৌশলে রাজপুত বীর রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থার খবরাখবর সংগ্রহ করতে চাইতেন। কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। নির্মলকুমারীও অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে "সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথ্যা উত্তর দিত। ঔরঙ্গ -জেব তাকে রত্নালঙ্কারে মুড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহল থেকে বাইরে যাবার কোন অনুমতি দেন নি। যোধপুরী বেগমের সঙ্গে কথাসূত্রে নির্মলকুমারী একটি ত্রিপদীছন্দের পদ আবৃত্তি করেছে :

সোনেকি পিঁজিরা সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কেও সেরেফ্‌ খয়ের মে।

যদিও এটি গান নয়, কিন্তু পদটি চতুর নির্মলকুমারীর মনোভাবজ্ঞাপক।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ "অদৃষ্টগণনা"-র নাম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র "নন্দনে নরক।" সেখানে মহানগরী দিল্লীর "চাঁদনী চৌক"-এর অসামান্য বর্ণনায় মোগল আমলের ঐশ্বর্য আড়ম্বর জাঁকজমকের কথা আছে। এই স্থানে অপরাধও যত সৌন্দর্যও ততোধিক। সেই "নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ" জন্মায়। সেখানে ফুলের, আতর গোলাপের ছড়াছড়ি, "নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ", গায়িকার কণ্ঠস্বরের কসরৎ, সারেঙ্গের সুরে নর্ত্তকীর নাচ ও গানের অসামান্য বর্ণনা আছে। শুধু বাদশাহদের জীবনই নয়, সাধারণ মানুষের জীবনও যে প্রমোদের জোয়ারে ভেসে যেত তা বোঝা যায় : "....গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, ...ফুলের ছড়াছড়ি, আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি, — নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ-অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয় কামিনী-করতল-কলিত তালের চট-চটা;...কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সারেঙ্গের সুরে নাচিতেছে, গায়িতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে," ইত্যাদি।

উপন্যাসের অপর চরিত্র সতেরো বছরের খর্বাকার "দরিয়াবিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্বদা প্রফুল্ল" এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে মবারকের পূর্ব-বিবাহিতা। বর্তমানে মবারক জেবউন্নিসার প্রণয়ার্থী জেনে সুরমা বিক্রয়ের ছলে অন্দরমহলের প্রতিহারীকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে, বখ্‌শিশের পয়সাও বাঁচিয়েছে আবার জেবউন্নিসা যাতে সেই গান শুনতে পান তার ব্যবস্থাও করেছে। দরিয়া "অতিশয় সুকণ্ঠ; সঙ্গীতে বড় পটু। অতি মধুর গায়িল।" জেবউন্নিসা তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন : "গা। ঐ বীণ আছে। বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরানিন্দিত সঙ্গীতবিদ্যাপটু, গায়ক গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেবউন্নিসা তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে?

দরিয়া। আমার এই গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেবউন্নিসা একটা ফুলের তোব্‌রা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া, কাণ কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেবউন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

জেবউন্নিসা দরিয়াকে নিজের থেকে অধিকতর শক্তিশালী গণনা করলেন। অসামান্যা রূপবতী ও অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠী দরিয়া তাঁর মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীত এখানে অনেকখানি ঘটনানিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: "খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে।" খলতাব্যঞ্জক সঙ্গীত না থাকলেও সঙ্গীতকে খলতা সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'আনন্দমঠ' অনুশীলন তত্ত্বের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা উপন্যাস— এ পর্যন্ত আলোচিত সকল উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত ভক্তিবাদে উপনীত হয়েছেন :

তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" তিনি গুরু-শিষ্য কথোপকথনে গুরুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : "ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। ....ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে।" উপন্যাসের পরিণতিতে সত্যানন্দ মাতৃভক্তিতে অবিচল থাকতে চেয়েছে। মহাপুরুষ চেয়েছেন জ্ঞানের মাধ্যমে সব কিছু বুঝে নিতে, "মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। .....কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে — ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।"

বোঝা যাচ্ছে যে, একটি তত্ত্বকথা প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনা করেন। সমস্ত মানুষকেই তিনি ইন্দ্রিয়মুখীনতা থেকে সরিয়ে এনে ভক্তিমুখী করতে চেয়েছেন। আর তাই অন্তরীক্ষে উপন্যাসমধ্যে বার বার শোনা যায় :

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

দস্যুদের হাত থেকে কৌশলে কল্যাণী কন্যাকে নিয়ে যখন আরো গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছে তখন ভক্তির প্রগাঢ়তায় প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত কল্যাণী অন্তরীক্ষে শুনেছে

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে..।" চোখের সামনে সে দেখেছে এক শুভ্রশরীর শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু শুভ্রবসন মহামুনিকে—বীণাহাতে "চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশ পথে" গেয়ে চলেছেন "হরে মুরারে মধুকৈটভারে"—মহেন্দ্র এবং কল্যাণী সমস্ত অরণ্যমধ্যে বার বার এই ধ্বনি শুনেছে, মনে হয়েছে যেন বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। শুধু তারাই নয়, গাছের পাখিরা, নদী, বনস্থলী যেন একতানে গেয়ে উঠেছে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে.....।" এই অনন্তের নামগান মানুষকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। যে মহামুনিকে কল্যাণী দেখেছিল তিনি সম্ভবত নারদমুনি। প্রাচীনযুগে এই মন্ত্রোচ্চারণও ছিল সুরসম্বলিত।

এছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যবহৃত "বন্দে মাতরম্" আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। ১৯০৫ সালের ১৯ শে জুলাই সরকারী তরফে বঙ্গবিভাগ ঘোষিত হবার পর কলকাতার টাউনহলে এই ঘোষণার প্রতিবাদে বিভিন্ন দিনে পাঁচটি সভা হয়। শ্রেণীনির্বিশেষে মানুষ সভায় সমবেত হয়েছিলেন। প্রথম সভা রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে ১৯০৫ সালের ৭-ই আগস্ট হয়, তৎকালীন সকল নেতাই সভায় উপস্থিত ছিলেন — ছাত্রদের সমাবেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। "যুবকদের মাথায় ছিল গেরুয়া উষ্ণীষ, বুকে "বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইবে" লেখা ব্যাজ, খালি পা এবং হাতে কালো পতাকা যাতে লেখা ছিল নানা স্লোগান, এদের মধ্যে অন্যতম 'বন্দেমাতরম্'। এরকম দৃশ্য কেউ পূর্বে দেখে নি। ....আব্দুল হালিম গজনভীর উদ্যোগে টাউনহলের আগাগোড়া কালো কাপড়ে ঢাকা হয়েছিল। কাপড় কেনা হয়েছিল হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান থেকে। বিদেশী কাপড় ব্যবহার করায় যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শে কালোকাপড় খুলে ফেলা হয়। ...যুবকের দল কলেজ স্কোয়ারে যখন সমবেত হয়েছিল তখন কেউ একজন অকস্মাৎ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করে ওঠে এবং তারই পূর্ণ প্রকাশ হয় টাউনহলের সভায়। অবশ্য কয়েক মাস আগে এপ্রিলে ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি 'বন্দেমাতরম'কে দেশাত্মবোধক ধ্বনি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তবে কোন সভায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি এই প্রথম।" একটি গান কেমন করে সমগ্র দেশের নাড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশবাসীর অভিলাষকে প্রকাশ করতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "বন্দে মাতরম্"। এসব কথা জানতে পারছি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বন্দেমাতরম্ ও স্বদেশী আন্দোলন" প্রবন্ধ (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৫) থেকে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরো জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ উক্ত 'বন্দেমাতরম্' গানটির কেবলমাত্র প্রথম স্তবকে সুরারোপ করেছিলেন। ১৯০৫ সালে গানটির ওই অংশবিশেষ রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়েছিল। যাঁর উৎসাহে এই দুর্লভ ঘটনাটি ঘটেছিল তিনি 'কুন্তলীন' সংস্থার এইচ্. বোস। পরে সরলাদেবীকে অনুরোধ করা হয়েছিল সমস্ত গানটিতে সুরারোপ করার জন্য। তখন থেকে সরলা দেবীর কণ্ঠে এবং অন্যান্য নানা গায়কের কণ্ঠে নানা উপলক্ষে গানটি গীত হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, এটি যতখানি না গান তার চেয়ে বেশি "দেশের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার আহ্বান, সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ, আনন্দ, বেদনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যঞ্জনা।" এই গান মানুষকে যে-কোন

ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজও করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছিলেন "ফরাসী বিদ্রোহের সময় বিখ্যাত 'লা মার্সেলিস' সঙ্গীত ছাড়া বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনও সঙ্গীত একটি জাতির মনে এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি করে নাই—"।" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরীয়সী" ভাবনারই বলিষ্ঠ প্রকাশ "বন্দে মাতরম্"। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমজীবনী' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধার করে লিখেছিলেন : "একদিন দেখিবে — বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালী উন্মত্ত হইয়াছে — বাঙ্গালী মাতিয়াছে।" সেকালে বন্দে মাতরম্ শব্দের অর্থ নিয়ে খুব মাতামাতি হয়েছিল সেকথা শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্কিমজীবনী" গ্রন্থে জানিয়েছেন। তিনি আরো জানাচ্ছেন যে, কাঁটালপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শন"-এ প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে গিয়েছিলেন, কিন্তু লেখা হয় নি। বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ করাতে বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" গানটি নাকি "ঝটিতি" লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মতে "এ গান ঝটিতি লিখিবার নয়। আত্মস্থ না হইলে তন্ময় না হইলে — অনুপ্রাণিত না হইলে এ গান লেখা যায় না।"

যে কোন তত্ত্বকে প্রকাশ করার জন্য গান একটি আবশ্যিক উপাদান। সেই কারণেই রবীন্দ্র নাটকে গানের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। "আনন্দমঠ"-এও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু গান, বলা ভাল, গানের সঙ্গে কিছু মন্ত্র, স্তোত্র। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বৈষ্ণবের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, তবে তা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবমন্ত্র নয়। সত্যানন্দ বলেছেন : "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে — উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় — কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন — তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময় — সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব — কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।" একদিকে কল্যাণ, প্রেম; অপরদিকে শক্তিতেই ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকাশ। "ধর্মতত্ত্ব"-এ বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখে বলেছেন : কৃষ্ণ বা ঈশ্বরের "শারীরিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত।" এই সর্ব্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা প্রেমময়কেই বঙ্কিমচন্দ্র নমস্কার করেছেন, আনত হয়েছেন। তাই সত্যানন্দ "শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বনমালী বৈকুণ্ঠ নাথ, ...কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দ্দন, লোকপালন", মঙ্গল, বল, ভক্তি, ধর্মে মতিদানকারী বিষ্ণুর কথা স্মরণ করে গেয়ে উঠেছেন :

জয় জগদীশ হরে।
প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিচিত্র বহিত্র চরিত্রম্ খেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

"দশ সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদীকানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তোপের শব্দ

ডুবাইয়া দিয়া সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল —

জয় জগদীশ হরে

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।

চতুর্থ খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে শান্তি বৈষ্ণবীর বেশে ইংরেজ শিবিরে গেলে সিপাহীরা তাকে "কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়; ফরমাস করিয়া শুনিল।" সিপাহীদের কাছে তাদের মনোমত গান শুনিয়ে রসবিমোহিত করেছে শান্তি, আবার মেজর সাহেবের কাছে গিয়ে "মর্ম্মভেদী কটাক্ষ" হেনে গান গেয়ে উঠেছে "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।" পাত্র বা শ্রোতা হিসাবে গানেরও রকমফের ঘটিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে আমরা শুনেছি দশভুজার স্তোত্রপাঠ "সর্ব্বমঙ্গলা-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে। / শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।" দেশমাতৃকা এবং দেবী দুর্গা তাঁর কাছে সমার্থক। তিনিই আবার মৃদুস্বরে গেয়েছেন :

ধীর সমীরে তটিনীতীরে

বসতি বনে বরনারী।

মা কুরু ধনুর্ধর গমনবিলম্বন

অতি বিধুরা সুকুমারী।

এ গান তো শুধু 'হরিনাম' নয়, গূঢ় সংকেতবাহী এক গীত যার সংকেত ধরে জীবানন্দ কল্যাণীর মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হরিণচর্ম পরিহিত পুরুষবেশী সন্ন্যাসী শান্তি যখন একা "গভীর বনমধ্যে" প্রবেশ করেছে তখন বনদেবীগণ যেন অরণ্যমধ্য থেকে গেয়ে উঠেছেন ঃ

১

"দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"
"সমরে চলিনু আমি হামো না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর-তরঙ্গে,'
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
"রমণীতে সাধ নাহি, রণজয় গাও রে।"

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে।"

এই কথোপকথনমূলক গানে শান্তিকে ত্যাগ করে জীবানন্দের সন্তানধর্ম গ্রহণের প্রসঙ্গ

আছে। জীবানন্দ দেশের কাজের জন্য নারীকে আপন জীবন থেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন — এ তারই গান। আবার তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শান্তির কণ্ঠেই শুনেছি :

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

শান্তির এই গানের সঙ্গে জীবানন্দর কণ্ঠস্বর মিলিত হ'ল, আরো মিলিত হ'ল জীবানন্দের বাজানো সারেঙ্গীর সুর। "অতি নিবিড় বন, শাখা পল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটীর" — জীবানন্দ একাকী বসে "সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।" জীবানন্দ দেশের কাজের জন্য নারীসঙ্গ পরিহার করেছিলেন। এতদিনে যৌবনের প্রবল জোয়ার দুজনকেই আলোড়িত করেছে। শান্তির গান তারই ইঙ্গিত। এই প্রসঙ্গে শান্তি জীবানন্দকে বলেছে : "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মে সহায়। ...দুইজন একত্রে সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?

জীবানন্দ আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিলেন, "শিখাইলে ত!" শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, ...'ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে, বল বন্দেমাতরম।" তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িল।"

দেশের মুক্তির জন্য নারী ও পুরুষের সমান প্রয়োজন। উভয়ে একত্রে দেশমাতৃকার চরণে সমর্পিতপ্রাণ হওয়া চাই। জীবানন্দ যে সব ত্যাগ করে একা দেশমাতৃকার সেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা যথার্থ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-তে বলেছেন : "যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা

স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা ....বলিতে হইবে না।" এই জন্যই ঔপন্যাসিক জীবানন্দের সঙ্গে শান্তিকে মিলিত করেছিলেন। কোন স্বভাববিরুদ্ধতাতে দেশমাতৃকার যথার্থ সেবা হয় না। শান্তির গানে সেই কথাই বলা হয়েছে যে, বালির বাঁধ ভেঙ্গে জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, তাকে বাধা দিয়ে রাখবে এমন সাধ্য কার আছে? বাধা দিলে ইপ্সিত ফললাভ ত হয়ই না, তার বিপরীত বিনাশই ঘটে।

তৃতীয় খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদে জীবানন্দের অনুপস্থিতিতে শান্তি সারঙ্গ বাজিয়ে গেয়েছে :

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিত বহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

রাগ-তাল-লয় সমন্বিত জয়দেবের এই স্তোত্রটিতে শান্তির মধুর নারীকণ্ঠের সঙ্গে গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ একটি পুরুষকণ্ঠ (সত্যানন্দের) মিলিত হয়েছে। ফলে এই গান "অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ" করে প্রচারিত হয়েছে দিকে দিগন্তরে। "তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু" গেয়ে শান্তি সত্যানন্দকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়েছে।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ষাকালে জ্যোৎস্নারাত্রে নানাবর্ণে চিত্রিত বজরার গালিচা বিছানো ছাদে অনিন্দ্যসুন্দরী যৌবনবতী জরির ফুলতোলা মিহি ঢাকাই শাড়ি পরিহিতা বহুরত্নমণ্ডিতা এক যুবতী "মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা" ছিলেন। এ নারী স্বয়ং দেবী চৌধুরাণী। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় "চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে— যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে; এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তরসকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজাইতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে, — বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু — কত মিঠে রাগিণী বাজিল — কেদার, হাম্বীর, বেহাগ কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল — কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী — কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল — নাদ; কুসুমের মালার মত নদীকল্লোল স্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই একটা পর্দা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্-ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কাণের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল — মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল —বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাটি আশ্চর্য অভিব্যক্তিসমৃদ্ধ। বীণের ঝালা, মীড়, তেহাই সব যেন তাঁর বর্ণনার মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেবীচৌধুরাণী

বীণাবাদনপটিয়সী এক রমণী। তাঁর লোকেরা যতক্ষণ অন্য বজরায় ডাকাতি করছিল ততক্ষণই তিনি উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য মনোমোহিনী বীণা বাজিয়ে চলেছিলেন। দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল নিশিঠাকুরাণীর কাছে। এই বীণাবাদনবর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। আশ্চর্য ভাষার শক্তি, বীণা যেন কথা বলে ওঠে : "বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, ...।"

'সীতারাম' উপন্যাসে গানের পরিবর্তে আছে কিছু সংস্কৃত স্তোত্রের ব্যবহার। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত লক্ষ্য। মুসলমান সেনারা সীতারামের দুর্গ আক্রমণ করলে সীতারাম একাকী নিঃসঙ্গ, মৃত্যুর দ্বারবর্তী, বিধ্বস্ত। সেই সময় শ্রী ও জয়ন্তী জানু পেতে বসে দুই হাত যুক্ত করে "গগনবিহারী গগনবিদারী কলবিহঙ্গনন্দী কণ্ঠে ....ডাকিতে লাগিল —

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ —
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।

"জ্ঞান ও ভক্তিরূপিনী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তসুরসংবাদিনী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল ....।" হরিনামের মধ্য দিয়ে সব বিপন্মুক্তির কথা বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বেও বলেছেন। আমরাও দেখি, মুসলমান সেনাকবলিত দুর্গমধ্য থেকে অকস্মাৎ জয়ধ্বনি উঠেছে "জয় মহারাজকি জয়। জয় সীতারাম কি জয়।"

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম জীবনী" গ্রন্থে লিখেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি অন্তরে — বাহিরে প্রকাশ পাইত না। লোকে যেমন উঠিতে বসিতে হাই তুলিতে 'হরি বল' 'হরি বল' করে, তিনি কখন ঐরূপ করিতেন না। হরিনাম তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন; তবে উচ্চকণ্ঠে গীতাপাঠ করিতেন। ভিক্ষুক করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে আসিলে বঙ্কিমচন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। কখন ললাট কুঞ্চিত হইত,কখন বা চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত হইয়া আসিত।"

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদে জয়ন্তী ও শ্রীর মুখে শোনা যায় :

জয় শিব শঙ্কর। ত্রিপুরা নিধন কর।
রণে ভয়ঙ্কর। জয় জয় রে।
চক্র গদাধর। কৃষ্ণ পীতাম্বর।
জয় জয় হরি হর। জয় জয়রে।

এবং পুনর্বার বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। ...সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার?" বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাসই যে সীতারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সাহিত্যের সঙ্গে যে কোন শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। যিনি সাহিত্যসম্রাট তিনি সাহিত্যকে বহুমুখী শিল্পজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে সার্থকতা দিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচয়িতা যিনি সঙ্গীততত্ত্ব ব্যাখ্যাতাও। কিন্তু কেবল তত্ত্বজ্ঞান থাকাই শেষ কথা নয় যদি না তাকে প্রয়োগকুশলতা দেওয়া যায়। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প— সার্থকতার প্রমাণ। শ্রীশিবদাস চক্রবর্তীর "কবি বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধটি (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫) এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "স্বদেশীযুগের সেই রক্তক্ষরা দিনগুলিতে 'বন্দেমাতরম্' দেশাত্মবোধের মন্ত্ররূপে, জাতির মুক্তি-সঙ্গীতরূপে যুবমানসে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। ....বঙ্কিমচন্দ্র যদি এই একটিমাত্র কাব্যগীতি রচনা করে যেতেন, মনে হয় তার জন্যই মহৎ কবিরূপে ভারতপূজ্য হয়ে থাকতে পারতেন। এর মধ্যে কার্লাইন-কথিত 'মিউজিক্যাল থট্' এবং শেলী-কথিত 'দি এক্সপ্রেশন অব দি ইমাজিনেশন'-এর সার্থক সমন্বয় ঘটেছে।" কার্লাইন কিম্বা শেলীর ব্যবহৃত শব্দগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গান সম্পর্কেও ব্যবহার করা চলে। বিশেষতঃ উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলি কিম্বা প্রবন্ধের গানগুলি সম্পর্কে দ্বিতীয় মন্তব্যটি খাপে খাপে মিলে যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতভাবনা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয় যা উচ্চমার্গীয় শিল্পভাবনায় সমৃদ্ধ।

তারাশঙ্করের গান

বড় মাপের সৃজনশীল লেখক যাঁরা তাঁরা নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন হাজারখানা করে। তাই কেউ কেউ শুধু গল্প উপন্যাস নাটকাদি লিখেই আত্মকে প্রকাশ করেন, কেউ কেউ গল্প উপন্যাস নাটকের সঙ্গে সঙ্গে গান শিল্পকর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়েও আত্মকে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে বলেছিলেন—"তুমি দেখেছো অনেক, এত দেখলে কি করে?" এই মন্তব্যটিকে যদি একটু গভীরে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বোঝা যাবে যে, এই দেখা কেবল মাঠ-ঘাট-লোকজন-দ্রষ্টব্যস্থান-সমাজ-সংস্কারই নয়—এই দেখা প্রকৃতপক্ষে জীবনকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দেখা। তা নাহলে আর সাহিত্যিক বা শিল্পীর বিশেষত্ব কোথায়? ওপর ওপর যা দেখা যায় তা তো হাজারটা মানুষই দেখে, শিল্পীর চোখে তারও পরে সাধারণের না-দেখা অসাধারণত্বটুকুই ধরা পড়ে আর সেকারণেই মানুষ হিসাবে বহিরঙ্গ বিচারে আর দশজনের থেকে স্বতন্ত্র না হলেও শিল্পী হিসাবে তিনি হন একক, অ-সাধারণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গল্প, উপন্যাস এবং নাটক লিখেছিলেন যেগুলি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে জীবন্ত হয়ে আছে। এই সমস্ত গল্প উপন্যাস নাটকে প্রয়োজনমত বাণীবয়ন করেছেন শুধু কাহিনীবর্ণনায় নয়, গীতরচনায়ও। কোন বক্তব্য যখন কেবলমাত্র দৈনন্দিনের ভাষায় লিখে সবটুকু প্রকাশ করা যায় না তখনই গানের প্রয়োজন হয় সেখানে শুধু বাণী নয়, সুরের মোহময় আবেগ মনের ভাব বা আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে প্রকাশ করে দিতে পারে। " শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয়, আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করতে থাকে।" বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যে ব্যবহৃত গান বা বিভিন্ন গীতরচয়িতার সৃষ্ট গানগুলি ঠিক এইরকম করেই নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে শতরূপে প্রকাশ করার বিশেষ মাধ্যম : "কোনো প্রতিভাবান সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের একটি রীতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। ...তাঁর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস যতই বাড়তে থাকে ততই নব নব শিল্পের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে চলেন। জীবনের শেষের দিকে তারাশঙ্করের মধ্যে এমন কিছু শক্তির বিকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল। কিছু চিত্রশিল্প, কিছু দারুশিল্প বা কুটুম কাটুম এবং অনেকগুলি গীতশিল্প অর্থাৎ সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে।"—একথা বলেছেন শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকাদিতে যে গানগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন চরিত্রের বা পরিস্থিতির উন্মোচন ঘটিয়েছে অবশ্যই। সংখ্যায় সেগুলি শতাধিক একথা জানিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু গান যে এখনও নানা পত্র-পত্রিকা বা ডায়রীতে ছড়িয়ে আছে এমন ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। তাঁরই সম্পাদনায় ৮০টি গানের সংকলন 'তারাশঙ্করের গান' নামে প্রকাশিত হয়েছে, ভবিষ্যতে অপ্রকাশিত গানগুলি কোন গবেষকের উষ্ণ সদিচ্ছায় প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি।

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্র হওয়ার দৌলতে বেশ কিছু গান বহুকাল থেকেই শ্রোতাসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। যেমন--'মধুর মধুর বংশী বাজে,' 'প্রাণের রাধার কোন্ ঠিকানা কোন্ ভুবনের কোন্ ভবনে,' 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি,' 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে,' ' তোমার শেষবিচারের আশায় বসে আছি,' ' চোখে ছটা লাগিল তোমার আয়না বসা চুড়িতে,' 'কাঁচের চুড়ির ছটা ছেঁয়াবাজের ছলনা,' ইত্যাদি। এসব গান যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে তাদের সার্থকতা সন্দেহাতীত। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত গানগুলি যখন পৃথক কোন সংকলন করে প্রকাশ করা হয় তখনই বোঝা যায় যে, গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ অংশ-বিচ্যুত হলেও শুধু স্বতন্ত্র গান হিসাবেই এমন গানের পৃথক মূল্য রয়েছে। 'তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি'--গানখানির মধ্যে যে জীবনদর্শন আছে তা এই রকম--জীবনের সমস্ত বিকিকিনি সাঙ্গ করেও হয়ত শুধু চোখের জলই শেষ পর্যন্ত পাওনা হয়ে থাকে। জীবনের খেয়াঘাটের বিভিন্ন ঘাটে বারে বারেই মাশুল দিয়ে পারাপার হতে হয়--আশা থাকে, যদি কিছু পাওনা থেকেথাকে। আর যদি কোনই প্রাপ্তি না থাকে তবে অথৈ জলের সর্বনাশায় নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ঈশ্বরের কাছে নৌকার মাঝির এই কাতর নিবেদন কি শুধুই 'ডাকহরকরা'র মাঝির? এই আবেগ, এই ব্যাকুলতা, এই জিজ্ঞাসা তো প্রতিটি মানুষের জীবনেই সত্য। সুতরাং এই গানটিকে অন্তরের আবেগ দিয়ে বুঝতে গেলে সবসময় যে বিশেষ পরিস্থিতির উপস্থিতি জরুরী এমন নয়।

প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার ব্যাকুল অপেক্ষার কথা আছে 'তমসা' গল্পের 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি' গানটিতে। 'তমসা' গল্পটি যদি জানা থাকে তবে এই গানগুলির রসোপভোগে আর একটি বাড়তি মাত্রা সংযোজিত হয় মাত্র। আর জানা না থাকলেও গানের ভাব অনুধাবনে কোনই বিভ্রান্তি ঘটে না। প্রেমিকের জন্য পথের ধারে, নদীর ধারে চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল প্রেমিকার কাজল পরা জোড়া আঁখি। বিশেষ গল্প না হলেও এর অর্থ অনুধাবনে কোনই ক্ষতি হয় কি?

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এই বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গীত শুধু মাত্র পরিস্থিতিনির্ভর নয়, তার একক স্বতন্ত্র উপস্থিতি শ্রোতার মনকে বিশেষ ভাবে আপ্লুত করতে পারে যদি তার মধ্যে জগৎ ও জীবনের গূঢ় তত্ত্ব ব্যঞ্জিত হয় যা সর্বসাধারণের কাছেই সত্য বা Truth হিসাবে স্বীকৃত। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে...স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কোন বধির তাহা শুনিতে পায় না।" (র র-১৫, পৃ:৬৩) এইখানেই তারাশঙ্করের মত কথাসাহিত্যিক তথা গীতরচয়িতাদের সার্থকতা যে, আপাত উচ্চারিত গীতলহরীকে অতিক্রম করে তাঁরা অ-গীত অ-শ্রুত গীতধ্বনিকে আপন অনুভবের গভীরতায় ধরতে পারেন।

তারাশঙ্করের গানের ভাষা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ই বলতে হয় যে, বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক শব্দ, নিছক মুখেই ব্যবহৃত শব্দ যা ইতিপূর্বে গীতরচনায় অপাংক্তেয় ছিল তাদের তিনি গানে ব্যবহার করে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন-

ক্যানে, দ্যাশে দ্যাশে, পাগুড়ী, ছুতোনাতা, লক্ষপিদীম, চন্দ সূয্য, আতান্তর, ব্যায়লা (বেহালা), জেবন, ভোবন, ছেঁয়াবাজি, অঙ্গের ছটা, খাঁ খাঁ, ঠাণ্ডা-শেতল, দিপিং দিপিং, ঝুঁঝকি আলো, ফিসিং ফিসিং অঙের খেলা ইত্যাদি। এগুলির কোন কোনটি অঞ্চল বিশেষের, কোন কোনটি আবার উচ্চারণ বিকৃতির ফলে শব্দের উক্ত রূপ প্রাপ্তি--যেমন জেবন, ভোবন, জোনাকির আলো বোঝাতে ঝুঁঝকি আলো--এসবের কোনটাই ইতিপূর্বে সাহিত্যে স্বীকৃত নয়। কিন্তু ওই সমস্ত শব্দ সহযোগে যখন গানগুলি রচিত হল তখন কিন্তু শব্দগুলি কোন বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে এক গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হল। তাই রসিকচিত্ত গানে শব্দগুলি শুনে রসিকতা করে না, বরং রস উপভোগ করে। সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গান নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল ও সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ভাষা যদি মানুষের ভাবপ্রকাশেরই বাহন হয় তবে কেবলমাত্র কবিতা ও গান রচনার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহারের ছুঁৎমার্গকে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্করের গানের এইসব শব্দ ব্যবহার বা ভাষা কোনক্রমেই বাংলাগানের ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে একথা বলা যাবে না। যেখানে পূর্ণিমার 'রাত যেন ঝলসানো রুটি' এই ভাষা ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা থাকে না, বরং উপমার নতুনত্বে আমরা অভিভূত হই, যেখানে শব্দব্যবহারের সীমানা যে অনেক বেড়ে যায় তা স্বীকাব করতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। আবার এসব গান যেহেতু কোন-না কোন চরিত্রের মুখে দেওয়া সেকারণে অবশ্যই চরিত্রদের কথা ভেবেই গানের ভাষাও নির্বাচন করতে হয়। তাছাড়া, গানের এইসব শব্দ ব্যবহার বা এই ধরনের চরিত্রসৃজনও আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, রসিকতা কতখানি জীবন ও মাটির কাছাকাছি। নিছক কল্পনার দ্বারা ঠিক এই জাতীয় গান রচনা করা যায় না যদি না ব্যক্তিগত অনুভূতির গভীরতম স্তরে অনুপ্রবেশ ঘটে। বলা যায়, এ গান যেন আত্মোন্মোচনের এক বিশেষ প্রচেষ্টা। একথা তো নিশ্চিত সত্য যে, সঙ্গীত ভাবেরই প্রকাশ--" যেখানে....সংগীতই মুখ্য সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলই বলতে থাকে আমি কেউ না, আমি কিছুই না; আমার মহিমা সুরে। এইজন্য হিন্দুস্থানী গানের কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা খুশি তাই। এই যে পূরবীর গান--

লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া
ক্যয়সে ধবুঁ মেরে
শিরো'পর গাগরিয়া।

এর মানে, 'শ্যাম আমার জলের কলসী রাখবার বিড়েটা চুরি করেছে।' এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড়ো সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধবামাত্র মন বলে, এই যে কলসী এই যে বিড়ে, এতো সামান্য কলসী সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা কিছু চুরি, যার দাম বলবার মত ভাষা জগতে নেই, যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।" (র র-১০-ছন্দ পৃ: ৯১৫) শ্রদ্ধেয় বিমান মজুমদার সেকারণেই বলেছেন, "তারাশঙ্করের গান বাংলা গানের একটি বিরাট ভাব ও ভাষার সম্পদ।"

"শনিবারের চিঠি"-তে প্রকাশিত 'তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ'

প্রবন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছিলেন : "রাঢ়ের গ্রাম্য সমাজে বৈষ্ণব-বাউলদের আখড়া আছে অনেক, তান্ত্রিক সাধুর আশ্রমও আছে অনেক।... একতারা খঞ্জনী বাজিয়ে পদাবলী ও বাউল গান গেয়ে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।....মুসলমান ফকিররাও আসে, হাতে সারেঙ্গের মত বাদ্যযন্ত্র, বাজপাখির মত ছোট পাখি, কণ্ঠে দেহতত্ত্বের গান, হিন্দু দেবদেবীর গান, মা-যশোদার বেদনা-গান।" তারাশঙ্করের সঙ্গীত প্রীতির ব্যাপারটি নিছক ভুঁইফোড় নয়। খুব ছোট বয়স থেকেই নানা গায়কের গান, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি তিনি শুনেছিলেন ও দেখেছিলেন। জমিদার বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় নিমন্ত্রিতদের ঢালাও ব্যবস্থা, বাজি, লাঠিখেলা, নাটক ইত্যাদি হত। রাসপূর্ণিমায়ও সমারোহের অন্ত ছিল না। উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়াও খেমটা নাচ ইত্যাদি হত। নীলকণ্ঠ-শ্রীকণ্ঠ-সিতিকণ্ঠ এবং মতি রায়—প্রভৃতিদের বিখ্যাত যাত্রার দল আসত, কৃষ্ণযাত্রার নামকরা অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসতেন দল নিয়ে। লোকে লোকারণ্য, গান চলছে। ...পর বৎসর উপযাজক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়' এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সেবার তিনি গান করলেন। সে কি গান। আর সে কি জনতা। সে কি স্তব্ধতা। মানুষ হাসল বুক ভাসিয়ে কাঁদল।" গানকে তো এভাবেই ভালবাসতে শিখেছিলেন তারাশঙ্কর শৈশব থেকে। এই গানের দ্বারাই তিনি এও দেখেছিলেন যে, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে কি করে শৃঙ্খলিত করা যায়—জীবনে এটাও বড় কম শিক্ষা নয়।

জীবনের পঞ্চাশোর্ধে পৌঁছে তারাশঙ্কর যখন কৈশোর কালের কথা স্মরণ করেছেন তখনও সেইসব মানুষের কথা মনে পড়েছে যাঁরা প্রথমজীবনে মুখ্যত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপকারী ব্যক্তিকে স্মরণ, দেনা-পাওনার শুদ্ধ হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে নাম শুনতে শুনতে কিংবা জপের মালায় জপ করতে করতে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। এসব মানুষদের দেখেই তারাশঙ্করের নিজেরও মনে হয়েছিল যে, মৃত্যুকে এমন আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিতে পারাতেই অমৃতবিন্দুর আস্বাদ পাওয়া যায়। একথা মনে করার সময় কোন দর্শনচিন্তা নয়, কোন উৎকৃষ্ট কাব্যকবিতা নয়, রামকৃষ্ণদেবের গানের একটি পঙ্‌ক্তিই মনে পড়েছিল—"আন্ রে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে।"

তারাশঙ্করের পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত রসিক এবং সুগায়ক। বাড়িতে বৈষ্ণব বাউল যারা আসতেন তাঁরা "খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন।.... কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশী হাতে তৈরি সারেঙ্গী যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপালহারা মা যশোদার বেদনার গান। কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন—

এই দেহে কিবা ফল—পদ্মপত্রে জল—
এ দেহের মিছে গৌরব করি মন।

কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন। অঞ্চলে যত পীর আছেন, হিন্দুর জাগ্রত দেবতা আছেন, সবাই ছিলেন পীর, সকলের মহিমাই কীর্তন করতেন তাঁরা। সে কি হিন্দুর

দোরে, কি মুসলমানের দোরে, তাঁরা ওই গানই গেয়ে যেতেন—সকলেই ভক্তি পুলকিত চিত্তে শুনত।" (আ. সা. জী.-পৃ:৭০-৭১)।

এছাড়াও দ্বিজপদ পটুয়া নামে একজন সুন্দর চেহারার পটুয়া "লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রামলীলা-গৌরাঙ্গলীলার ছবি দেখিয়ে গান গাইত "অহো কি মধুর লীলা রে।" বিভিন্ন ছবির সব শেষ ছবিটি ছিল নদীর ঘাটে নৌকা নিয়ে কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। দ্বিজপদ গাইত--"ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে ভাসলে সে যে পার করে।"(আ. সা. জী. ৭২-৭৬)

বেদে সাপুড়েরা আসত বর্ষায় মাঠে-ঘাটে সাপ ধরতে। তাদের গানের কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালেও তারাশঙ্করের মনে ছিল—

ও কালীলাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে প'ড়ে ধুলাতে।
কালী—লা--গ।

কিংবা,

ও জানি না গো—ওগো—এ-মন হবে।
গোকুল ছাড়িয়ে কালা মথুরা যাবে।

কিংবা,

কালিদহের ও লাগিনী ফুঁসিস না-এমন ক'রে ফুঁসিসনা।
ও তারে—দেখলে লাজের মাথাখাবি তাও কি মরণ বুঝিস না।
ও লাগিনী ফুঁসিস না।

রাধিকা বেদেনী নামে একটি বেদের মেয়ে এক রাশ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি নিয়ে তারাশঙ্করের মন জয় করে নিয়েছিল। কোন কোন সময় আবার সাপ নয়, বাঁদর নিয়ে এসেও সে গান গাইত—

হীরে মন নাচ দেখিলো।
তেমনি তেমনি তেমনি করে করে, বাহার করে,
ও হীরে মন নাচ দেখি লো।
যেমন আমার খোকাবাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবি লো।

একদল দেশী যাযাবর—ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াত—তারাও যখন আসত ঢোলক বাজিয়ে গান গাইত। এরা সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করেও গান গাইত—

ও—মহারানীর মিত্যু হ-ই-ল।
ও—বড়লাট ছোটলাট কাঁদিতে বসিল।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি-সংক্রান্ত গানও এদের কাছেই শোনা—

ও—বিদায় দেমা—ফিরে আসি। (আ. সা. জী. - পৃ: ৭২-৭৬)

ম্যাজিকের দলের মেয়েরাও 'দুই হাতে তুড়ি মেরে, দেহখানি নৃত্যদোলায় দুলিয়ে দিয়ে গান ধরত—

উর্‌র্‌র্—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জার ঘিনা না—
উর্‌র্‌র্—র্—— (ঐ পৃ: ৭২-৭৬)

ডাকঘরে কাজ করতেন ব্রজজ্যেঠা—অত্যন্ত আনন্দময় আত্মভোলা একজন রসিক পুরুষ ছিলেন—ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, দেখতে সুপুরুষ এবং সুমিষ্টকণ্ঠের অধিকারী একজন গায়কও ছিলেন—'ছুটি ছাটায় বাড়ি এসে গ্রামের পথে বেরিয়েই গান ধরতেন—"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।" (পৃ: ১০২-১০৩)

'পুজোর পর মাস দুয়েকের মধ্যে আসতেন অনেক গায়ক। কাপড়ের খোলে সযত্নে ঢাকা তানপুরা বগলে নিয়ে এসে উঠতেন।... যে গায়করা আসতেন, গ্রামের প্রতিষ্ঠাবানদের বাড়িতে তাদের বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। কোথাও এক টাকা, কোথাও দুটাকা, কোথাও বা চার টাকা।....গান শোনাতেন, গল্প শোনাতেন। পুরনো কালের গায়কদের গল্প, নতুনকালের গায়কদের গল্প। সেতারী আসতেন।" (ঐ পৃ: ১০৮)

এছাড়া গ্রামের শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় যিনি প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মত, দুর্লভ সুকণ্ঠ, জন্মগত সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী; পরবর্তীকালে রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতপ্রতিভা বালক বয়স থেকেই তারাশঙ্করকে মুগ্ধ করে রেখেছিল-"এমন সতেজ এবং সুডৌল মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর বোধহয় আমার জীবনে শুনি নি। সে সুরমাধুর্য আজও কানে লেগে রয়েছে। শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টক, রবীন্দ্রনাথের 'কে হে মম মন্দিরে' এ গান দুখানি ছেলেবেলায় শুনেছি, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।" (ঐ পৃ: ১৪৭-১৫০) নির্মলশিববাবু যাত্রার পার্ট লিখতেন এবং যাত্রা করতে আগ্রহী এমন ছেলেদের খোঁজখবর করতেন। মজলিস বসত, গান-বাজনা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। রাধাচরণ ভট্টাচার্য, লাভপুরের বাসিন্দা অল্প বয়স থেকেই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং সুকণ্ঠী ছিলেন।

লাভপুরে ফুল্লরা দেবীর স্থানে মেলা হ'ত, আজও হয়। সেখানে একবার ফকির অধিকারীর যাত্রা এসেছিল, কিন্তু গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা, আলাদা আসর থাকা সত্ত্বেও সে গান শুনতে যেতে পারেনি। তাই তারা স্থির করেছিল, ফকির অধিকারীর যাত্রাগানের আসর তারা নিজেরা চাঁদা তুলে করাবে। নিত্যগোপাল বাবুর সহায়তায় শেষপর্যন্ত গান হয়। তারাশঙ্করের পিতার বন্ধু ব্রজজ্যেঠাও আত্মভোলা রসিক মানুষ ছিলেন—ভাল গাইতে পারতেন। তারাশঙ্করের পিতার অসুস্থতার শেষ সময়েও তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন একটি গান গেয়েই—

"ওভাই কানাই, তু ভাই বিনে রাখাল খেলা হয় না খেলা—
তু ভাই শুয়ে থাকলি ঘরে, যায় চলে যে গোঠের বেলা।"

তারাশঙ্করের পুত্র শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, লক্ষ্মীপূজার পর ছুটিতে বাড়ি পৌঁছে তিনি দেখেন যে, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘদেহী বাউল, "গায়ে....নানারকমের ছিটকাপড়ের তৈরী বা ছিটকাপড় বসানো পা পর্যন্ত লম্বা আলখাল্লা।....নাম খুব সম্ভবত 'গুদুরি।...উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে দরাজ গলায় বাউলগান গেয়ে চলেছেন। ঘরের মাঝামাঝি জায়গাতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন ধ্যানমগ্নের

মত পিতৃদেব—তাঁর কোলে আমার চারবছরের শিশুপুত্র রঞ্জন।...বাউলের পাশে বসে আছেন দুটি কিশোর--মাথায় চুড়োবাঁধা গলায় তুলসী কণ্ঠী, তাঁরা দুজনেই প্রৌঢ় বাউলের সঙ্গে দোহারগিরি করে চলেছেন।.... প্রৌঢ় বাউল হঠাৎ লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালেন, গান ধরলেন—

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, আমি
চুল ভেজাবো না—
আমি জলে নামবো, জল ছিটোবো,
কিন্তু জল তো ছোঁব না—।

...প্রায় দশ-পনেরো মিনিট চলল ওই গান--সমস্ত আসর একেবারে গমগম করছে।...কানে এল অতি সুমিষ্ট কিশোর কণ্ঠস্বর—ওই সুন্দর ছেলেটি গাইছে—

গৌরাঙ্গের গাড়ি ছাড়ছে সোনার
নদীয়ায়—
সে গাড়িতে নিতাই হয়েছে ট্রেনের
ড্রাইভার,....।

মিষ্টি সুরে গানের কথায় মনে মনে সে গাড়িতে চড়ে বসলাম আমি—চুপটি করে চোখ বুজে রইলাম। ...হঠাৎ মগ্নতা ছিন্ন করে কানে এসে বাজল—

পোড়া বিধি বাদী হলো—কৃষ্ণপ্রেম
হতে দিলো না—
প্রেম করা সই আমার হলো না—
কৃষ্ণ প্রেম আমিয়া ফল—এবার আমার
ভাগ্যে হল না—।

গানের কথা, সুরের মূর্ছনায় আমরা যেন সকলে হারিয়ে যাচ্ছি। বুক থেকে ঠেলে উঠছে অবরুদ্ধ কান্না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও হারিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম বাবার চোখে জল, আনন্দময় দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে ধরেছে—আমারও অবস্থা ওইরকমই—চোখে প্রচুর জল।"

যে প্রৌঢ় বাউলের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি অবনীধর দাস, রবীন্দ্রনাথকে বাউল গান শোনাতেন। দুটি কিশোর গায়ক বসেছিলেন--তারা পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল ও লক্ষ্মণ দাস—একথা জানিয়েছেন শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, তাঁর পিতা তারাশঙ্করের মধ্যে বাউলিয়া মনটি এইসব পরিবেশ ও গায়কদের থেকেই তৈরি হয়েছিল। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর লেখা—

"তোমার শেষ বিচারের আশায়—বসে .
আছি।
তোমার রাজকাছারীর দেউড়ীতে হে—
বসে আছি।"

(পশ্চিমবঙ্গ—১৪০৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যো: সংখ্যা)

* শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালক— কোলকাতা ও তৎকালীন বম্বে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি।

অসামান্য এই গানটি রসিক বোদ্ধাকে জীবনের পরিণাম সম্পর্কে অশ্রুসজল করে তুলতে পারে অনায়াসেই। তারাশঙ্করের অধিকাংশ গানের মধ্যেই বাউল গানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি হওয়ার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। (আ. সা. জী. - পৃ: ৮৯-৯১)

গ্রামের সতীশডোম একটু পাগলাটে ধরনের কবিযশঃপ্রার্থী মানুষ ছিল। সে আনমনে পথে পথে কবিগান গেয়ে বেড়াত। তাকে নিয়েই 'কবি' উপন্যাসের কবিয়াল নিতাইকে সৃষ্টি করেন তারাশঙ্কর। আর সে সময়েই "পুরো একবেলা চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ মনে এসে গেল, "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে?" (আ. সা. জী.—পৃ:১৭)।

'কবি' উপন্যাসের গানগুলির পটভূমি সম্পর্কে বলতে গিয়ে "আমার সাহিত্যজীবন"-এ তারাশঙ্কর বলেছেন :

"ঝুমুর দল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুরদল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।....ঝুমুরদলের মেয়ে ঝুমুরদলে নাচে—তার মেয়ে, তার মেয়ে নেচে আসছে। গেয়ে আসছে। এরা পদাবলী জানে, খেউড় জানে। আবার আধুনিক খেমটা-টপ্পাও জানে। ....পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের ছোটবড়-ভালমন্দ নির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন ক'রে দেশে ফিরত। এই ছোটবড়দের মধ্যে ছোটরা শেষ প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদিরসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়।... ফোঁটা তিলক মালা ফেলে কেশবিন্যাস হ'ল স্বৈরণীর উপযোগী, গায়ে উঠল পিতলের গহনা-চুড়ি বালা বাওটা বাজুবন্ধ চিক হার, কানে কান, কপালে ঝাপটা। পায়ের নুপূর ঘুচে উঠল ঘুঙুর। তবুও আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বন্দনা না ক'রে গান শুরু করে না। এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে আমার মনের মধ্যে এরা একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই নিতাইয়ের কবিয়ালির সঙ্গে বসনের কথা জুড়ে দিয়েছিলাম।

'কবি'র এই ইতিহাস। 'কবি'র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কিভাবে করেছি বলতে পারি না। মোহিতলাল 'কবি' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গানগুলির কথাই আগে বলেছেন। বলেছেন, এই গানগুলিই কবির প্রাণশক্তি। আমি সেসময় নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম। "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।" এই লাইনের সঙ্গে অনেক লাইন বেঁধেছি।—"কালো চোখের তারায় তবে আলো এমন হাসে ক্যানে?" "কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা কাঁদে ক্যানে?" অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি। ও নিতাইয়ের রচনা হয়নি।"

তারাশঙ্করের জীবনাদর্শের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস, ন্যায়ানুগত্য, ধর্মবোধ প্রবল মাত্রায় ছিল। এ ছিল অনেকটাই পারিবারিক ঐতিহ্যের মত বিপদে দুর্বিপাকে স্থির লক্ষ্য। তিনি জীবনের যে কোনো জটিলতার সমাধান খুঁজেছেন ব্যক্তির অধ্যাত্মচেতনার গভীরে। আর অতি অবশ্যই এই অধ্যাত্মচেতনা কোন তথাকথিত সংস্কার নয়, মানুষের শুভ ও কল্যাণের সঙ্গেই তার সংযোগ। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম' বলতে যা বুঝেছিলেন— 'যা সমাজকে ধারণ করে

থাকে'— সেই শুভ ও কল্যাণ চেতনাকেই অধ্যাত্মচেতনা রূপে বুঝতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁর রচিত গানগুলির অধিকাংশ গানেই তাই মানুষকেই বড় করে দেখতে চেয়েছেন, প্রেমকেই মুখ্য অবলম্বন করেছেন। মানুষের জন্য এমন ব্যাকুল প্রেম তো ঈশ্বর-প্রেম থেকে পৃথক নয়। "কালা তোর তরে বসে আছি কদমতলায়"—গানের 'কালা' কে? হতে পারেন তিনি কৃষ্ণ, প্রেমিক পুরুষ, কিংবা হতে পারেন জীবনেশ্বর—যার জন্য সারা জীবন ধরে শুধু অপেক্ষাই করে যেতে হয়—পাওয়া সহজসাধ্য নয়। শ্রীবিমান মুখোপাধ্যায় 'তারাশঙ্করের গান' সংকলন গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন তারাশঙ্করের লেখা কৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি কীভাবে গাইতে হবে তার নির্দেশ তারাশঙ্করই রবীন মজুমদারকে দিয়েছিলেন 'রবীন—প্রেম আর ভক্তি দুটো এক হলে তবে এই গান হবে।" এই প্রেম মানবপ্রেম এবং মানবপ্রেমের ঐকান্তিকতার প্রতি যে ভক্তি যার গাঢ়তা, একাত্মকতা আমাদের চোখে জল আনে—তারই সংমিশ্রণে এসব গানের সার্থকতা। 'কবি' উপন্যাসের এই গানটি—

আহা—ভালবেসে—এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস আমি কাঁদি
বাঁশি বাজুক কদমতলে রে।
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি হবে আমার রাজা
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে।
আমার ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপুজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে।

ভালবেসে প্রেমিকা চোখের জলে ভাসছে, তবুও প্রেমিকের সব কলঙ্ক নিজে বহন করে প্রেমিককে সে অন্তরের রাজা করতে চায়। প্রেমিকার হার মানা আসলে তো হার নয়—প্রেমিককে জয় করে নেওয়া। প্রেমিকার ভালবাসা দিয়েই প্রেমিকের, আরাধ্যের চরণপূজা হবে। এই-ই তো ভক্তি। আরাধ্যই এখানে ঈশ্বরপ্রতিম। অতএব এই গান গাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই চাই দরদ, মমতা, প্রেম এবং মানসিক ঐকান্তিকতা যার অপর নাম ভক্তি।

ডায়রীতে পাওয়া এই গানটি—

আমার মনের গোপন কথা
যাই বলে গো তোমার চরণতলে
ভাসাও আমায় ভাসাও নয়নজলে।
চোখের জলের নামলে বাদল ঝরঝর ধারায়—
আমার বাহির ভুবন হারায়—
আমার মন-ভুবনের প্রবাল দ্বীপে
সোনার কিরণ ছড়ায়—

এই জীবনের হারামণি সেই কিরণে ঝলমলিয়ে জ্বলে—
হারামণি রত্নমণির প্রদীপ হয়ে জ্বলে—
ভাসাও আমায়, ভাসাও নয়নজলে।

কি অসামান্য আত্মনিবেদন এই গানে, চোখের জলে ভেসে কবি আত্মশুদ্ধি ঘটাতে চেয়েছেন।

তারাশঙ্করের কণ্ঠে সুর ছিল না বলে জানিয়েছেন তাঁর পুত্র শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি যে একটি অর্গ্যান কিনে বাজাতেন— একথাও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ই জানিয়েছেন। এ থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কণ্ঠে সুরের অভাব থাকলেও মনের তারে সুরের ঘাটতি কখনও হয়নি, সর্বদাই অনুরণন ঘটেছে—"যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা সংগম। (র. র-পৃঃ ৯১৪)।" তারাশঙ্কর গান বেঁধেছেন, কিন্তু সুরারোপ করেন নি, আর সুরারোপ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা প্রগাঢ় আন্তরিকতায় শব্দ ও সুরের যুগলবেণীবন্ধনে গানগুলিবে সার্থকতা দান করতে পেরেছিলেন বলেই তারাশঙ্করের গানগুলি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছিল।

কিংবা 'কবি' উপন্যাসের নিতাই বসনের প্রতি এক অলৌকিক প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছে— তাই সে বলে—

মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি
মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।

প্রকৃত প্রেম তো স্থূল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে না, বাইরের পাওয়ার চেয়ে মনে সত্য করে পাওয়ার মূল্য যে অনেক বেশি। এই অবস্থায় নিতাই-এর কাছ থেকে বসনের অর্থাৎ প্রেমিকের কাছ থেকে প্রেমিকার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। না পাওয়া এবং পাওয়ার টানাপোড়েনে প্রেমিক এক ভিন্নতর মাত্রায় পৌছে যায়। তখনই সে বলতে পারে,

এই খেদ আমার মনে—
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়—জীবন এত ছোটো কেনে?
এ ভুবনে?

জীবনমুখী গান

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে নানা রূপে ও আকারে। যখন শিল্পের বোধ মানুষের তৈরিই হয় নি সেই প্রিমিটিভ যুগেও মানুষ গল্প বলেছে নিজেকে নিয়েই, তার সারাদিনের অভিজ্ঞতাকেই উপস্থাপিত করেছে তার সঙ্গীসাথীদের কাছে। কখনো বা পাথরে আঁক কেটেছে, তারও বিষয়বস্তু অবশ্যই তার চেনাজানা পরিবেশ ও জীবন। পাথর খোদাই করেছে যখন তখনও ত মানুষ তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জগত ও জীবনকে বাদ দিয়ে, বিশেষত যেখানে উভয়েই উভয়ের পরিপূরক, কোন কিছু করা বা ভাবা ত সম্ভবই নয়। মানুষ যখন শিল্পসৃষ্টি করতে শিখল তখনও তার ভাবনার কেন্দ্রস্থলে মানুষের জীবন ও তারই সঙ্গে জড়িত জগত। এর বাইরে বিষয়ই বা কি থাকতে পারে? রবীন্দ্রনাথের কথায় গান "তখন তখনি জীবন-উৎস হতে তাজা উঠছে.....।" এ কথা যে কোন শিল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য। "আপনাকে প্রকাশ করা মানুষের অভিপ্রায়" বলেই সে চিত্রবিদ্যা-সঙ্গীত-নৃত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য তৈরি করেছে নিজেকে নানান খানা করে দেখবার বাসনায়। এই বাসনা থেকেই "সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করতে থাকে।" মানুষের এই আশা আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না কখনও তার বহিরঙ্গ জীবনাশ্রয়ী, কখনও বা জীবনচেতনার গভীরতম স্তর থেকে ঘটেছে তার উৎসার, প্রকাশ পেয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার। শিল্পকে গভীরতা দিতে তখনই প্রাধান্য দিতে হয়েছে নিছক খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার বহিরঙ্গ জীবনকে নয়—হৃদয়াবেগকে, মনকে, অন্তরকে। আর তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকলে বড়ো শিল্পও টিকতে পারে না।"

বাংলার আদিতম রচনা চর্যাপদ থেকে শুরু করলে দেখব যে, যদিও তা বিশিষ্ট ধর্মসাধনাশ্রিত, কিন্তু জীবনবিচ্ছিন্ন নয়। যে বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনাকে আশ্রয় করে এই চর্যাগীতি সে সাধনার সফলতা ত জীবনের মধ্যেই। এ সাধনা দেহভাণ্ডকে কখনো উপেক্ষা করে নি। মানবদেহের নাভিমূলে অবস্থিত নিম্নাভিমুখী সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে মস্তিষ্কে উষ্ণীষচক্রে মিশ্রিত করতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। সুতরাং মানবজীবন, মানবদেহ চর্যাগীতিতে উপেক্ষিত নয়—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।

কিংবা,

টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

—এসব পদের গূঢ়ার্থ যা-ই হোক না কেন, তার বহিরঙ্গ অর্থ ত মানবজীবনাশ্রয়ীই। মঙ্গলকাব্য ত দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনেরই কথা বলে। চাঁদ

সদাগরের কাহিনী, লহনা-খুল্লনার কাহিনী তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবলী বাহ্যতঃ রাধা-কৃষ্ণের রূপকাশ্রিত, আসলে তা নর-নারীর কিংবা ভক্ত-ভগবানের মধুর সম্পর্কে সঞ্জীবিত। দুর্যোগের রাত্রে সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে কৃষ্ণানুরাগিণী রাধা যখন অভিসারে যাওয়ার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হন—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

—তখন যে কোন পার্থিব নায়িকা বা প্রেমিকার প্রেমিক সঙ্গমে যাওয়ার ছবিটিই কি চোখে ভেসে ওঠে না? প্রেমের জন্য, প্রেমিকের জন্য এই আকুলতা ত গভীরতর জীবনসত্য, তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই প্রেমিকার কাছে সমাজ, গুরুজন, নীতি সব উপেক্ষিত হয়ে যায়। সে বলতে পারে,

সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরমভয় লেশ।।

শাক্তপদাবলীও শক্তি সাধনার তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে রচিত হলেও মাতা ও পুত্রের সহজ সম্পর্কের মাধুর্যে সিঞ্চিত। পুত্র সেখানে মা-কে ভক্তি করে আবার গালিও দেয়, দোষারোপ করে ঠিক যেমন বাস্তবে ছেলে মা-কে করে বা মা ছেলেকে করেন। পার্থিব নানা জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাধক যখন গেয়ে ওঠেন "আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হল" তখন পুত্রের অন্তরের বিষাদের ভার কি মায়ের প্রাণে বাজে না? মানুষের কিই বা করার থাকে, মহাশক্তিস্বরূপিণী তাঁর সৃষ্ট জগতকে যেমন চান তেমনি রাখতে পারেন—

মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।।

—এও জগত এবং জীবন সম্পর্কে সাধকের নিগূঢ় এক অনুভূতি। শাক্তপদাবলী আসলে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত অনুভবের বহিঃপ্রকাশমাত্র। ভারতচন্দ্রের কাব্যও জীবনের বিচিত্র রূপের স্বাদবাহী। আরো পরবর্তী যুগে এসে পৌঁছলে আর দেবতার কথা নয়, মানুষ—একমাত্র মানুষই হয়ে উঠল সাহিত্যের উপজীব্য তার সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ বেদনা-যন্ত্রণাকে সঙ্গী ক'রে। শুধু গল্প-উপন্যাসই নয়, কাব্য-কবিতাও জীবনের গভীরতম চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ। সাহিত্য অতএব জীবনকেই মূল্য দিয়েছে, জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়েছে বার বার।

সাহিত্যের মতই সঙ্গীতও জীবন-বিবিক্ত কোন শিল্পরূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সঙ্গীত "যে রসে লালিত, সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলেছে।" সঙ্গীত যিনি সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাকে সুরে গান করেন উভয়েই চেতনাসম্পন্ন মানুষ—রবীন্দ্রনাথ

যাকে বলেছিলেন "যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে...।" যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথা ধরি তবে সেখানেও আছে নরনারীর প্রেমের কথা, প্রকৃতির কথা, বিভিন্ন ঋতুর কথা। ওস্তাদী অর্থাৎ খেয়াল "গানের মধ্যে romance এবং humanisation প্রবেশ লাভ করিয়াছিল,"—এমন কথা জানা যায়। শ্রদ্ধেয় অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় বলেছেন যে, ওইসব গানের মধ্যে "Universal human interest" ছিল। এই "Universal human interest"-ই গানকে জীবনের, মানুষের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

আমাদের দেশীয় লোকগীতিগুলি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সমাজজীবনকথা নিয়েই গড়ে উঠেছিল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সবসময়ই ছিল সমাজের উচ্চতম অভিজাত ব্যক্তিদের উপভোগ্য সঙ্গীত। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীরও ·যেমন রসোপভোগের বাসনা বা অধিকার আছে তেমনই দারিদ্র্যপীড়িত অতি সাধারণ গ্রামীণ মানুষেরও সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা, সঙ্গীত উপভোগ করার ব্যাপারটিও থেকেই যায়। এইসব সঙ্গীত অবশ্য মুখে মুখে প্রচারিত, তাদের লিখিত রূপ সবসময় পাওয়া যায় না। কারণ যারা সেসব গান গেয়েছে তারা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষজন নয় আর তাই সংরক্ষণের চিন্তাও তাদের ছিল না। সবটুকুই সংরক্ষিত হ'ত স্মৃতিতে। গ্রামীণ মানুষ নিজেদের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-যন্ত্রণা, মিলন-আনন্দের কথা এমনকি তাদের প্রয়োজনচালিত জীবনের কথাও তাদের গানের মধ্য দিয়েই বলেছে। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, সারি জারি, বাউল জাতীয় গানে গ্রামীণ মানুষের জীবনচর্যার কথা জানা যায়। নদী-অধ্যুষিত বাংলাদেশের গান ভাটিয়ালী যার বিষয় হল প্রেম। ভাওয়াইয়া গানের বিষয়ও নর-নারীর প্রেম। তবে এই প্রেমে অসম বিবাহজনিত ব্যর্থতার বেদনার করুণ আর্তি ঝরে পড়ে। বাউল গানে লালন ফকির যখন গেয়ে ওঠেন,

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?
লালন বলে জাতির কিরূপ
দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে।

—তখন সে গান কি জীবনবহির্ভূত কোন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে? জীবন অভিজ্ঞতার সূত্রে পাওয়া অনুভবকেই এমন হৃদয় গলানো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। তাছাড়া, এই গানের যে ব্যঞ্জনা তা কখনই তার বহিরঙ্গ জীবনাভিজ্ঞতার বিবৃতি মাত্র নয়।

ঝুমুর গানেও প্রেম বিরহ ও মিলনাকাঙ্ক্ষা আন্তরিকতার সঙ্গে রূপ পেয়েছে। এসব ছাড়াও আছে কৃষকের গান, ধানভাঙার গান, শ্রমজীবী মানুষের গান, ভাঙার গান (নজরুলগীতি), ভূমিকম্পের গান (নজরুলগীতি), গম্ভীরা গান, টুসুগান এবং আরো, বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত নানাধরনের গান। যদিও ধানভানার গান কিংবা টুসু গানের সঙ্গে

একই সারিতে নজরুলের 'ভাঙার গান' কিংবা 'ভূমিকম্পের গান'কে বসানো সঙ্গত নয়, তবু মানুষের ব্যবহারিক জীবনের, প্রয়োজনের জীবনের কথা মনে রেখে ওই ধরনের গানগুলির উল্লেখ করেছি। এসমস্ত গানের মধ্যেই নানা অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশে জীবন-নিংড়ানো অভিজ্ঞতার প্রকাশ আছে। জীবন সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই সমাজ-সচেতনতা আসে, এ সব গানেও এসেছে। এসব গানে বহিরঙ্গ জীবনের কথার মধ্যেই কোথাও কোথাও কিছু ভাবগভীরতা ধরা দিয়েছে অবশ্যই। মানুষ যখন কৃষিকাজ করতে শিখেছে, কৃষিজ ফসল ঘরে এনে ধান ভেঙেছে তখন শ্রমকে লাঘব করার জন্য, কাজের মধ্যে আনন্দ পাবার জন্য গান বেঁধেছে, কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার গানের মাধ্যমেই মানুষ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে অন্যের মর্মস্পর্শীও করতে চেয়েছে, বেদনার তীব্রতার হ্রাস ঘটিয়েছে। সুতরাং মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সঙ্গীতকে তার বৃহৎ কর্মকাণ্ডের অংশীদার করে নিয়েছে।

পরাধীন ভারতের মানুষ দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য স্বদেশী গান রচনা করেছে, গণসঙ্গীত রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সঙ্গীত ও ভাব" প্রবন্ধে বলেছেন— "ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, ...কিন্তু ছোট ছেলের মত তার উপর দাগা বুলিয়ে চিত্রিত করা, সেই কি আমাদের ধর্ম? .....সকলরকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই। কতরকম যুগের বাণী, কত দুঃখ, কত আঘাত আমাদের উপর পড়েছে। তার কিছু কি আমরা রেখে যাব না?....আমাদের সঙ্গীত, চিত্রকলা, রাষ্ট্রনীতি, আমাদের আপন হোক এই আমার কথার কথা।" এই যে যুগের বাণী দুঃখ, আঘাত এ সবই ত মানবজীবনকে ঘিরেই। যুগের ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সময়, মানুষের জীবন, ধ্যানধারণা ও তার ভাবনা-চিন্তাকে মিলিয়েই যুগের ধারণা তৈরি হয়। আমরা যখন কিছু 'রেখে যাবার' কথা বলি তখন জীবননিসিক্ত কোন বিশেষকেই বোঝায়।

কাঙাল হরিনাথ যখন গান বাঁধেন—

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে।

—তখন জীবনাবসানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটি মানুষের পরমকারুণিকের কাছে আত্মনিবেদনের করুণ আকুতি আমাদের অন্তরকে মথিত করে তোলে, নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ে। শ্যামাসঙ্গীতে সাধক যখন গান ধরেন—

বল্ মা, আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে-বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা।।

—তখন এ গানে মাতা-সন্তানের মান-অভিমান বোঝার জন্য ত কোন তত্ত্বের প্রয়োজন নেই, জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই এই পদের অর্থ নিরূপণ করা চলে। যদি বাউল

গানের মধ্যে অনুসন্ধান করি—

আমি কোথায় পাব তা'রে
আমার মনের মানুষ যেরে
আমি হারায়ে সেই মানুষে
ঘুরে মরি দেশ বিদেশে,...ইত্যাদি

—তখন বাউলের মনের মানুষটিকে খুঁজে পাবার ব্যাকুলতা কি আমাদেরও স্পর্শ করে না? এই সব গানে "সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি-নিরপেক্ষ এক সাধারণ ভাবাদর্শগত বিমিশ্রতা ও অনুভূতির মর্মস্পর্শিতা" আছে যা যে কোন মানুষের অন্তর্দেশকে নিমিষে ছুঁয়ে যেতে পারে। এসব গান ছাড়াও রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের যে কোন গানই আমার বক্তব্যের স্বাক্ষর বহন করতে পারে। রজনীকান্তের গান—

আমি দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত
তুমি আমারে যা দাও সবই তোমারি মত।
আকুল হইয়ে মিছে চেয়ে মরি কত কি যে
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান দয়াময়
(তবু) নির্ভর জানে না এ অবিনত।

অতুলপ্রসাদের গান—

এত হাসি আছে জগতে তোমার বঞ্চিলে শুধু মোরে
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।
হাসিব হাসাব এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত কাঁদালেম কত প্রাণ,
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা দিলি ফাঁসি সেই ডোরে
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।।

রবীন্দ্রনাথের গান—

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।

কিংবা,

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

নজরুলের গান—

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়,
আমার কথার ফুল গো,
আমার গানের মালা গো,
কুড়িয়ে তুমি নিও।

—এইভাবে বহু গানের তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে শব্দের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে জীবনের অজস্র অনুভূতিকে, উপলব্ধিকে। মানুষ এবং মানুষের গড়া শিল্প যেহেতু জীবনবিমুখ হতে পারে না তাই যে কোনো বিষয়ই দেখি না কেন তা বারে বারে খুঁজেছে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আবেগকে। আরো একটু পরবর্তী কালের গানের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। দেখুন নিচের গানগুলি—

আমি যামিনী তুমি শশী হে
ভাতিছ গগন মাঝে
মম সরসিতে তব উজল প্রভা
বিম্মিত যেন লাজে।

অথবা—

ঝিকমিক জোনাকির দীপ জ্বলে শিয়রে
চারিধার থম থম নিঃঝুম
সাতভাই চম্পা জেগে দেয় পাহারা
পারুলের চোখে তাও নেই ঘুম, নেই ঘুম।

অথবা—

ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে কিবা ফল
তুই নিয়তির খেলার পুতুল
বুঝলি না কেন বল।

অথবা—

কাজল নদীর জলে ভরা ঢেউ ছলছলে
প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া
সোনার বরণী মেয়ে বল কার পথ চেয়ে।
আঁখি দুটি ওঠে জলে ভরিয়া।

—এখন সব গানেই হয় প্রকৃতি, নতুবা প্রেম, কিংবা কোন গভীর উপলব্ধির প্রসঙ্গ আছেই এবং সেগুলি মধুর সুরারোপে শ্রোতাকে সহজেই মুগ্ধ করে। রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া অন্য প্রায় সমস্ত গানের ভাষাই সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ। ভাষা হিসাবে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষা খুব কঠিন, তা নয়, কিন্তু সুগভীর ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ বলে অনেক সময় অর্থ বুঝতে মনঃসংযোগ দাবী করে। গানের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা আছে যা শুধু পড়ার জন্য নয়,

শোনার জন্যও; যা নিছক বস্তুভারাক্রান্ত নয়, হৃদয়ের আবেগজাত। এসব গানে সহস্ররূপে জীবনকে, জীবনানুভূতিকে বার বার পাওয়া সত্ত্বেও এদের 'জীবনমুখী গান' বলার প্রয়োজন হয় নি। যাঁরা গান লিখেছেন এবং যারা গান গেয়েছেন তাঁরা সকলেই জীবনরসরসিক।

অতি সাম্প্রতিক কালে একধরনের বাংলাগান শোনা যাচ্ছে যার নামকরণ করা হয়েছে 'জীবনমুখী গান'। এ যেন রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান, অতুলপ্রসাদের গান, বাউল গান, কীর্তন গানের মত স্বতন্ত্র একটি শাখা। বস্তুতপক্ষে তা-ই কি? যেখানে বলি রবীন্দ্রনাথের গান সেখানে গানের ভার ও গায়কীর একটা প্রসঙ্গ থেকেই যায়, সুরের মূল্যও তুল্যমূল্য। ঠিক এমনি কথাই খাটে নজরুলের গান সম্বন্ধে—গায়কীর প্রসঙ্গ। ভাষা সেখানে অবশ্যই খুব গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী নয়, কিন্তু সুরমাহাত্ম্যে ও ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙে সে গান অনন্য। বাউল গানেও তার বিশিষ্ট ভাব তত্ত্ব ও গায়নভঙ্গি মনে রাখার মত। কীর্তন মূলত ভক্তিভাবাবলম্বী হলেও রাধা-কৃষ্ণ অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার, গভীরার্থে ভগবান-ভক্তের লীলা আশ্রিত। গায়নভঙ্গির কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আবার এই গানের জন্য ব্যবহৃত খোল, করতালও তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। কিন্তু 'জীবনমুখী গান' বলতে কি এমন কোন বিশেষ গায়নভঙ্গি সম্বলিত গানকে বোঝায়? আমরা যখন শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনি—

যদিও আকাশ ধোঁয়াশায় ম্রিয়মান
তোমার জন্য লিখছি প্রেমের গান।
গলির মুখে নোংরা আবর্জনা
আস্ত নরকে নাগরিক গান বোনা
মনের সেলুনে রেডিওর মুলতান
তোমার জন্য লিখছি প্রেমের গান।
কেটে নেয়া গাছ গুঁড়িটা রয়েছে পড়ে
তাতে মেলে দেয়া রঙিন লুঙ্গি ওড়ে
রাস্তার কলে রিক্শাওয়ালার স্নান
তোমার জন্য লিখছি প্রেমের গান।
আচারের শাকসবজির অবশিষ্ট
নালায় ভাসছে কবেকার উচ্ছিষ্ট
ইঁটে মুখ গুঁজে কাক দেয় ঠোঁটে শান
তোমার জন্য লিখছি প্রেমের গান।,
ছোট্ট দোকানে খই মুড়ি চানাচুর
নকুল দানায় পিঁপড়ের ঘুরঘুর
সামনেই আছে খয়ের সুপুরি পান
তোমরা জন্য লিখছি প্রেমের গান।

বেঞ্চিতে আছে বেকার ছেলেটা বসে
বন্ধুর কাঁধে বিষণ্ন মুখ ঘসে
কমল কিছুটা যুবকের অভিমান
তোমার জন্য লিখছি প্রেমের গান।।

—তখন তথাকথিত আধুনিক গানের সঙ্গে গায়নভঙ্গির যে খুব বড় পার্থক্য আছে, এমন মনে হয় না। পার্থক্য যেখানে আছে তা হচ্ছে বিশেষত গীটারের সঙ্গে এসব গান গাওয়ার জন্য গীটারের স্ট্রোক অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ শব্দের ওপরে জোর পড়ে বেশি, ফলে অনেকসময় মনে হয় কেটে কেটে গানটা গাওয়া হচ্ছে। গানের যে একটা সুর প্রবাহ থাকে তা যেন এখানে অনেক সময় অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পার্থক্য হ'ল বিষয়বস্তুর এবং ভাষার। আগের আধুনিক গানেও প্রেমিকার জন্য বা প্রেমিকের জন্য গান লিখতে চাওয়া হয়ত হয়েছে, কিন্তু সেখানে হৃদয়াবেগের প্রকাশই হয়েছে মুখ্য। প্রেম যেহেতু মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম বৃত্তি তাই তাকে দৈনন্দিনের ব্যবহারিক জগতে নামিয়ে এনে গান রচনা করা হয় নি। মানুষের জীবনের সংগ্রাম ত সেকালেও ছিল একালেও আছে। আগের গানরচয়িতা সংগ্রাম বিক্ষোভের রূঢ় কঠিন জগত থেকে সরে এসে ক্ষণিকের জন্য শান্তির স্বপ্ন দেখতে চাইতেন। এখন যিনি গান লেখেন তিনিই গায়ক, অতএব গায়কের ইচ্ছানুসারে বক্তব্য প্রকাশিত হয়, বলা যেতে পারে বক্তব্যকে খুঁজে নিতে হয় জীবনের বঙ্কিম জটিল বিক্ষুব্ধ হতাশা আর নিরাশ্বাসের জগত থেকে। মানুষ এখন স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে বা স্বপ্ন দেখাকে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে পাগলামি বলে মনে করে। জীবনের তাগিদ সেকাল-একাল দুই কালেই থাকলেও তাগিদের হয়েছে রকমফের। মানুষকে আজ বাঁচতে হচ্ছে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা করে। তাই অলস দুপুরে বেকার যুবক যদি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চারপাশের ওই রূঢ় জগতকে দেখতে থাকে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। লোপামুদ্রার কণ্ঠে শুনি—

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে সিদ্ধ মনস্কাম।
পড়শী নদীটি ধনুকের মত বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনসুটি
বাঁশের সাঁকোটা শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের গায়ে দোল খায় ছুটি।

—মনটাকে অতীত স্মৃতিতে বিষাদগ্রস্ত করে। এখানেও বাস্তব জগতের প্রতিরূপ চিত্রণ আছে, কিন্তু ভাষা অনেক সংযত, পরিশীলিত। আজকের আধুনিক কবিতা ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে না, তার ভাষা ঋজু স্পষ্ট, তার অলংকার আসে নিত্যদিনের রূঢ় বাস্তবতার জগত থেকে, গানেও তেমনি। গানের ভাষায় আসছে 'উচ্ছিষ্ট,' 'পিঁপড়ের

ঘুরঘুর', 'রঙ্গিন লুঙ্গি' 'মুখ ঘসা' প্রভৃতি শব্দ যা আগে কোনদিন ব্যবহার করা হয় নি। গানের ভাষাও আজ অনেকাংশে স্থূল, জোরালো। তবে আমাদের সংস্কার এবং মন বলে "গান হবে যাতে, যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশী হয়; ....গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়।" গানের মধ্য দিয়ে এই অনুভবটুকুই আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে — "সঙ্গীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে।" বেসুরো জগতের আর অসুন্দর বিরূপতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত কারবার করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর তখনই মনের সজীবতা ফিরে পাবার জন্য গান শোনে। তাই কথা যখন শেষ হয়ে আসে তখনই গান হয় শুরু। আর সেকারণেই কথার ভাষা আর গানের ভাষার মধ্যে ঘটে পার্থক্য। তাছাড়াও, আজকের এই বিশেষ ধরনের গানের গায়কেরা নিজেরাই গান লেখেন এবং তাঁরা কেউই কবি নন। সাধারণ মানুষের উপলব্ধি যদি কবির হাতে পড়ে তবে তার রূপ হয় স্বতন্ত্র। গায়করা সত্যি কথা বলতে কি, সেই কাব্যময়তা আর চাইছেন না। গানের মধ্যে বাস্তবজীবনের যন্ত্রণা বেদনা ব্যর্থতার কথা থাকছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও ঋজু ভাষায় বলেই কি তাকে 'জীবনমুখী গান' নাম দেওয়াটা সঙ্গত? জীবনের যন্ত্রণা কি অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলে ছিল না? সেখানেও প্রেম ছিল, প্রকৃতি ছিল, ব্যর্থতা ছিল, বিরহ ছিল, মৃত্যু ছিল—কিন্তু জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসূত্রে জড়িত এইসব ভাবানুষঙ্গকে আলাদা করে নামকরণের প্রয়োজনীয়তা আসে নি। আজকের দিনের গান যেন অনেকখানি বিবৃতিধর্মী। মানুষ শুনছে ঠিকই, কিন্তু তার মন ফেলে-আসা ভালবাসার গানের জন্যই আসলে ব্যাকুল হয়ে উঠছে বলেই 'রিমেক" আসছে গানে। মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনের রূঢ় জগত থেকে সরে গিয়ে তার মন অধরাকেই ধরতে চাইছে। কেননা, মানুষ ত স্বপ্ন নিয়েই বাঁচতে চায়, সুন্দরকে চায়, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিগুলির জন্য আজও মানুষের মন কেমন করে। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের গান, নজরুলগীতি, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলি আমাদের বিক্ষত মনে প্রলেপের মত কাজ করে। জীবনকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মাধুর্যে ভরে দেয় বলেই এদের পৃথক করে 'জীবনীমুখী' বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুত পক্ষে জীবনই শিল্পের আশ্রয়, তাই তাকে আর স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত না-ই বা করলাম।
